॥ হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ॥

সপ্তসিন্ধু

পরিবেশক : সিগনেট বুক সপ,
১২, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলি-১২
ও
১৪২।১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি ২৯।

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ
১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলকাতা—১২।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬০।
আড়াই টাকা

ছাপিয়েছেন : শ্রীবিজয় কুমার মিত্র,
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬।

বিরাট দরবার। তার গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য দেখে বেশ ঘাবড়ে যাই, তবু ইণ্টারভিউ কার্ড পূরণ করে পাঠিয়ে দেই, আনন্দ এবং আতংক ভরা মন নিয়ে অপেক্ষা করি—কি বার্তা বহন করে আনবে জানি না!

প্রশংসা! পথচারী পেল এক নবরত্নের প্রশ্রয়! সেই সংগে তিনি সাবধান বাণীও পাঠালেন—"মা সরস্বতীর সাধনায় বায়নাক্কা বড ভীষণ, আমি ত চোখের জলে নাকের জলে, ভাবছি শেয়ার বাজারে ঢুকব।...... পুনরপি, সাধু সাবধান।"

সাহিত্যের দরবারে দ্বিতীয় দফায় হোঁচট খেতে গিয়ে সবার আগে মনে পড়ল সেই আলী সাহেব, অর্থাৎ ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা।

অবতরণিকা

দেশ-ভ্রমণ করা মানুষেব সখ বললে তাকে ছোট করা হয়, এ এক নেশা—তীব্রতম নেশা। কেউ যায় তীর্থযাত্রার ছলে, কেউ জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার মানসে, কেউ বা আভিজাত্য রক্ষার আবরণে। কেউ শিব-শম্ভু দেখে ভাবে গদ গদ হয়, কেউ তৃপ্তি পায় বন-বাদাড, সাপ-খোপ দেখে, কেউ নীরস পাথরের পাঁজা, কেউ বা নোংরা লবণাক্ত জল।

আমি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করিনি, আমার ঘর ছেড়ে পথকে সংগী কবা, অনেকটা যাবার জন্যে যাওয়া। তবু কোন সহরের আয়তন কত, সেখানকার ক-জন লোক গাড়ী চড়ে, পান-বিড়ির দোকানের সংখ্যা কত, চাল-আটার মণ প্রতি দক্ষিণা, খড়কে কাঠি মেলে কিনা ····· নোটবই ভর্তি কবে লিখে এনেছিলাম। ছাপার হরপে তাদের আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ দিতে গিয়ে দেখি, সাহিত্য-ধর্ম লগুড নিয়ে তেড়ে আসছে, বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হতে হল। তবে সত্যি কথা বলতে কি, পথে দেখা মানুষের পরিচয় দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হলে, সাহিত্য-সাধনা শুরু করাও হয়ে উঠত না।

আর একটা অনুরোধ, ছাপার ব্যাপারে ভুল ধরবেন না। আমার ধারণা, ব্যাকরণের কানমলা আর প্রুফের ঝামেলা সহ্য করা সাহিত্যিকের সাজে না। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত লেখকের একনায়কত্ব ভুল থেকে যাবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ।

উপকারীকে ভুলে যাওয়া মানুষের ধর্ম। সমাজে বাস করে ধর্মচ্যুত হওয়া শোভা পায় না। তবু কয়েকজন ভদ্রলোক, যথা শ্রীপূর্ণেন্দু ঘোষ, শ্রীতুলাল চক্র, শ্রীসুনীল সেন, শ্রীতারা দাস আর কে বি গুহ অর্থাৎ বই-এর জয়েন্ট হিরো, কানু জোরজবরদস্তি করে কাজ হাসিল করল। আঁছাড়াও যাঁরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ভরা গ্রীষ্মের বেলা দুপুর, স্তূপাকৃতি ফাইল-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছি মহাকরণে। মাথার ওপর ফুল ফোর্সে পাখা চলছে, তাপ প্রবেশের উপযোগী সকল ছিদ্রে খসখস-এর বর্ম পরানো। আরদালী বালতির পর বালতি জল ঢেলে চলেছে তাতে। কী বিশ্রী গরম! মনটা বিষিয়ে ওঠে; ফাইলে হাত দিতেও ইচ্ছে করে না। বিরক্ত হয়ে দৈনিক পত্রিকাখানা টেনে নেই। দেখা যাক, কতদূর তাপমাত্রা চড়ল, আবহাওয়া অফিস কি বলেন, কতদিন এমন চলবে?

পাতা ওলটাতে নজর পড়ল এক প্রবন্ধে; লেখক বাঙালী, ভারত সরকারের হয়ে এক কাজে গেছেন রাওয়ালপিণ্ডি। কেতাদুরস্ত সাহেব সেজে তিনি চলাফেরা করছেন, লোকে ভুলেও তাঁর দিকে চেয়ে দেখে না। ষ্টেশনের এক পাশে উৎসুক হয়ে একদল লোক যেন কি দেখছে, তাদের চাহনীতে কেমন যেন চাঞ্চল্য। বিশুদ্ধ উর্দুতে জিজ্ঞাসা করতেই একজন বলে, ওখানে হিন্দু এসেছে। ভদ্রলোক ভাবেন, হিন্দু নিয়ে হৈ হট্টগোল? তাহলে কি দাংগার সূত্রপাত হল? কিন্তু এখন ত এ অঞ্চলে হিন্দুর নাম-গন্ধ নেই, তবু মনটা মুহূর্তে শংকিত হয়ে ওঠে। মুখে সে ভাব প্রকাশ করেন না, বরং যেন হেসে উপভোগ করেন কথাটা; বলেন—তাহলে দেখে আসতে হয় মজাটা?

ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের মধ্যে মূল্যবান জিনিষপত্র রাখার জন্যে যে সব ঘর থাকে, এ তারই একটা, এবং চারিদিক ঘেরা। তাছাড়াও আছে কয়েকজন রাইফেলধারী রক্ষী আর ভেতরে প্রাণ হাতে করে বসে আছে একদল শিখ

তীর্থযাত্রী। কাছেই বিখ্যাত তীর্থস্থান পান্‌জা সাহেব—গুরু নানকের স্মৃতি-বিজড়িত বিরাট পীঠস্থান, তারা সেখানে চলেছে ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে। অদ্ভুত লাগে না? নিজেদের দেশে, নিজের ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেও মানুষের কত দুর্ভোগ ভুগতে হয়, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে রক্ষী সমভি-ব্যাহারে চলতে হয়!

কি ছিল দেশটা! মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কি মারাত্মক পরিবর্তন। আস্তে আস্তে জীবনের পাতা পেছন দিকে উল্টে যায়। মনে পড়ে যায় অতীত দিনেব কথা; চোখের সামনে ভেসে আসে এই পান্‌জাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো।

ভাবতেও ভয় হয়, এমনি ভরা গ্রীষ্মে একদিন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম। আজ খসখস-এর আবরণ টেনেও অতিষ্ঠ হচ্ছি; সেদিন সূর্যদেবকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করতেও দ্বিধা করিনি। দুই বন্ধু মিলে যাত্রা করেছিলাম ভারতভ্রমণে। সংগে অবশ্য পি. এ. ছিলেন, হাড-গোড-বের-করা সাইকেল।

* * *

মে মাসের সংক্রান্তির কাছাকাছি, কলকাতার ওপর টেম্পারেচার টেম্পার দেখাচ্ছে এক নাগাড়ে, সহসা যেন বিশ্বের সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, সহর আর নেই, হয়েছে সাহারা। এমনই এক শুভ-লগনে ঘর ছেড়ে পথের সংগে গাঁটছড়া বাঁধলাম।

কৃষ্ণ পেচকের অভিনন্দন, খালি কুঁজো আর সামনে বারবেলা, এই ত্র্যহস্পর্শ সংযোগে যাত্রা শুরু করলাম। কর্ণধারকে নমস্কার জানাবার জন্যে আহ্বান করতে হল না, ভক্তের টানে তিনি নিজেই এলেন দধি-মংগল জানাতে; সে মংগলময়ী হলেন মা উড়নচণ্ডী—যাদের মনে যাযাবর হবার বাসনা, তাদের ওপর তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। মায়ের অধম সন্তান মোরা,

তাই সম্বলের মধ্যে লোটা-কম্বলও জোটেনি; খালি দু-খানি দ্বিচক্রযান আর পকেটে সাড়ে-তিনখানি দশ টাকার নোট।

রবীন্দ্রনাথ মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, শীর্ণ-শান্ত পুত্রদের ধরে দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে। কিন্তু তেমন মা ভূ-ভারতে দেখা যায় না। তবে! ঋষিবাক্য মিথ্যা হবে! মায়ের দয়ার শরীর; স্নেহের দুলাল সন্তানদের যদি লক্ষীছাড়া করতে মন না সরে, নিজেরা উদ্যোগ করে ঘর ছেড়ে বেরোবার ষড়যন্ত্র করতে পারি।

কেবল ভয় সমালোচকদের। কোন জিনিষ তেরচা করে না দেখতে পারলে তাদের স্বস্তি নেই। আসলে তাদের চশমার কাঁচগুলো অপটিকালি সংশোধিত নয়। ভাববেন না, খালি একটি দোষ আছে, স্ফেরিকাল, ক্রমেটিক, অ্যাষ্টিগমেটিক……তা সর্বদোষ-সমন্বিত। উদাহরণ দিয়ে আরও ভাল করে বলে দেই—ধরুন, নিখুঁত চৌকো জিনিষটি রয়েছে; চশমা এঁটে সমালোচক এলেন, সংগে সংগে ডিসটরশন—হয় মনে হবে জিনিষটি ব্যারেল, না হয় পিনকুশান।

এই চশমাপরা বিদগ্ধজন কথা শুনেই হো হো করে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠবেন—এদিকে ত ল্যাক-প্যাক-সিং, হাড়-ডিগডিগে, তোমরা করবে বিশ্ববিজয়! নিধিরামের ঢাল-তলোয়ার না থাকলেও, সে তালগাছের জটার মত মোচে তা দিয়ে, বজ্র-গম্ভীর নিনাদ বার করে, ক্লাস ওয়ান সর্দার হতে পারে; কিন্তু সেপাই চলেছে তালপাতার···হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। তাঁদের অবগতির জন্যে রেফার করতে হয় শরৎ-চন্দ্রের পথের দাবী, সব্যসাচী কোন কালেই ভীমভবানী ছিলেন না। নেপোলিয়ানও ছিলেন খর্বকায়, তাঁকে তুষপ্রাণী বলা যায়। অদৃষ্টের কি পরিহাস! বৃদ্ধ বয়েসে তিনি কলির ভীমের মত বিশাল বপুতে পরিণত হলেন, গদাই লস্করী গাম্ভীর্য এল চলনে; অথচ এই নব কলেবরই নাকি ওয়াটারলু যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

কত কাকুতি-মিনতি জানাল ব্যাচারা সাইকেল, গভীর অনিচ্ছা প্রকাশ করল চরণযুগল, মনটা নিঃশব্দ আবেদন জানাল ঘরের জন্যে, তবু দুর্ভাগ্য আমাদের, মাত্র কয়েক দিনে পেরিয়ে গেলাম বাংলাদেশ—বংকিমচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনার দেবী—সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং……। যেদিন ঋষিকে অবমাননা করে তাঁর মাতৃ-বন্দনার ওপর কলম চালানো হল, সপ্তকোটিকে করা হল ত্রিংশকোটি, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের বিপদপাত, তাই সুজলা বলতে আছে, পচা খানা-ডোবা; সুফলা হয়েছেন, জিয়োমেট্রিক প্রগ্রেশনে বাড়ান অগণিত ফলবতী কন্যাকে বক্ষে ধারণ করে; শ্যামল আজ ধবল-ধূসর রূপ ধরেছে—তাই দুর্ভিক্ষের জোয়ার-ভাটা খেলে।

মোদের গরব মোদের আশা বাংলা ভাষাকে বাতিল করতে হল, নমস্কারের বদলে 'নমস্তে জী' বলে আশ্রয়ের জন্যে দরবার জানালাম। বাংলা বিহার পাশাপাশি দেশ। আত্মীয়তা বাইরের নয়, নাড়ীর টান আছে, অংগাংগি সম্পর্ক—একান্নবর্তী পরিবারে সহোদর ভাইতে-ভাইতে যেমন থাকে। তবে বিহারের রাস্তাগুলো বড় অভদ্র—সাইকেলের প্রতি তাদের কোন দয়া-মায়া নেই, বড় বড় খোয়া আর খানা-খন্দ দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে মেজাজ দেখাতে থাকে। দেশটা পাহাড়ে পূর্ণ করে সৌজন্য প্রকাশেও গভীর অনিচ্ছা জানিয়েছে—একবার বৈকুণ্ঠধামের উদ্দেশে উর্ধমুখী হও, আবার পাতাল-প্রবেশের সন্ধান কর। নামার সময় প্রাণপণে সাইকেলের ব্রেক কষে ধরতে হয় গতিবেগ সামলাতে; ওঠার সময় সিন্দবাদ দৈত্য ঘাড়ে চাপে, তখন বোঝার ভারে বৈরাগীরও মনে বিতৃষ্ণা জাগে।

দেশটা আবার বন-সম্পদে ভরা—আছে ঘন বন, গহন ভয়সংকুল অরণ্য। দিন-দুপুরে রেপটাইলস রাজপথে এসে অবসর বিনোদন করে, হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়ে। এখন ভরা গ্রীষ্ম, তাই রবিবাবুর অনুগ্রহ একটু বেশী, দুপুরে মনেহয় টাটা কম্পানীর ব্লাষ্ট-ফার্ণেসের মধ্যে

আমাদের ফেলে দিয়েছে; সে যেন বিরাট দীঘি, টগবগ্ করে ফুটছে অথচ ছট্‌ফট করেও কূল-কিনারা কিছু মেলে না।

পরেশনাথ পাহাড় ভেঙে মহামন্দিরে পদযুগলের মূর্তি দেখতে গিয়ে প্রায় পথে বসেছিলাম আর কি? বিনা আহারে এ বিহার করার চেয়ে এভাবেই জয় করা সহজ।

হাজারিবাগের বাঘও বে-কায়দায় ফেলেছিল। একদিন রাত-দুপুরে গভীর জংগলে সাইকেলের মুখভার, অসুস্থতার অজুহাতে গোঁসাইজী আপাততঃ আমাদের বহন করতে নারাজ। তার কত শত যোজনের মধ্যে জন-মনুষ্য নেই, আছে কয়েকটি ভয়-ধরানো সাবধান-বাণী। বুঝলাম সৌভাগ্যের যোগাযোগ না থাকলে এমন হয় না। পথে আরও দেখা মিলল অর্ধ-দগ্ধ-শব-সুশোভিত শ্মশানভূমি। খেয়াল নেই ক-ঘণ্টা জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে এগিয়েছিলাম, জীবনটা পদতল থেকে বক্ষে ফিরে এল এক সাঁওতাল পল্লী পেয়ে। সাঁওতালদের ধারণা, ওদের ওপর ভূত-প্রেতের অনুগ্রহ একটু বেশী, নিশুতি রাতে সকল ভূতই বিভীষিকাময়, তায় যদি সাহেবী পোষাক পরা ভূত হয়···তারা ত এই মারে কি সেই মারে।

তারপর যুক্তপ্রদেশ। তখনও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ, প্রদেশের আগে তাই 'উত্তর' তারা লাভ করেনি। ঋতুটা পড়েছে 'বরিষণ মুখরিত রাত্রি'র। রাত্রিকালে যা হোক, দিনে যদি বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর-এ ক্ষান্ত হত, না হয় বর্ষা-মংগলের সুর ভাঁজা যেত, কিন্তু এ যে পচা বর্ষা। ঈশানের পুঞ্জ মেঘ, শান্ত-শিষ্ট ছেলের মত বসে নেই, বরং চলেছে মেঘ মল্লারের মল্লযুদ্ধ। তাই হৃদয় আর ময়ূরের মত নাচবার সুযোগ পেল না, অভিশাপ দিল ঋতু-সুন্দরীকে।

তবে যুক্তি ওরা মানে। একজনকে সোশ্যালিষ্ট পার্টির গুণপনা গাইতে শুনে, সাময়িক ভাবে সমাজতান্ত্রিক সাজতে দোষ কি, এই ফরমূলা

কাজে লাগালাম। ফলে আশ্রয়ের বদলে লাভ করলাম অর্ধচন্দ্র। সে নাকি যাচাই করছিল আমাদের।

তবু বলতে হবে, অতিথির পদমর্যাদা দিয়ে তারা ভাল মনেই সংকার করেছে। হাজার হোক লক্ষ্ণৌর নবাবের দেশের লোক—আসফউদ্দৌলার রাজত্বে দুর্ভিক্ষের সময় রোজ রাতে রাজপ্রাসাদ ভাঙা হয়েছে, আবার দিনে হয়েছে গড়া, দেশবাসীকে অন্ন দেবার জন্যে। তাই প্রজারা গাইল—যিসকো না দে মৌলা, উসকো দে আসফউদ্দৌলা।

আমীর ত ও দেশের লোকই ছিল। বউ চুলোয় যাক, তার স্মৃতির জন্যে গড়েছে বিশ্বের আশ্চর্য সৌধ। কবিকে দিয়ে ফেলিয়েছে চোখের জল। আরও আছে, লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব এক ব্রাম্হ মুহূর্তে দেখেন, পাদুকাযুগল মুখ ঘুরিয়ে আছে। জুতো ঘুরিয়ে দেবার লোকের অভাবে পালান হল না, অভিমান ভরে ইংরাজের হাতে বন্দী হলেন।

রোদ-বৃষ্টি-প্রুফ অভাজন মোরা। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষে'র দেওয়া ফুটন্ত তেলে নাড়াচাড়া খেয়েছি প্রচুর। এবার যমুনা পেরিয়ে লালকেল্লার পাশ দিয়ে দিল্লীতে পা দিলাম—মনে কি আনন্দ! বুঝলাম, ঘরকুনো বাঙালীকে ঘর থেকে লক্ষীছাড়া করে বের করতে পারলেই শাপে বর হয়।

দিল্লী অনেক দূর; সেই দিল্লী আজ পদদলিত করে চলেছি।......তোবা, চশমা পরা সমালোচক এলেন, অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি দিয়ে বলেন, লোকে রেলগাড়ী ছেড়ে প্লেন ধরেছে, আর তোমরা প্রগতি ছেড়ে অধোগতির দিকে চলেছ, তাতেও এত বড়াই? সেকথার উত্তর দেবার আগেই, অসহায় শংকিত চিত্তে জেগে উঠল দুর্ভাবনা, সকল অমল আনন্দ চিন্তা-সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল—এখন চাই যে একটি থাকিবার মত ঠাঁই। ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে, ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা। আমাদের আশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা নয়, মাত্র কয়েকদিনের জন্যে।

*　　*　　*

ঘরছাড়া আজ আড়াই মাস। এর মধ্যে একজনের সংগে আমাদের গভীর সম্পর্ক হয়েছে। রঙীন কল্পনায় ভেসে মুখ মিচকে হাসবেন না, পাড়ায় পাড়ায় মুখরোচক গল্প রটাবার জন্যে উন্মুখ হবেন না, তেমন কিছু নয়। তবে আর এক ভয়, ঠাট্টা করে না উড়িয়ে দেন। সব ধাপ্পাবাজী, সাইকেলের আবার প্রাণ আছে নাকি, এমন ধারা প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করে বসেন? তাহলে আপনাদের বোকা বনতে হবে। আচার্যদেবকে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিশ্ববাসী বোকা বনেছিলেন! তিনি প্রমাণ করে দিলেন, গাছও কেমন কথা বলে। লজ্জাবতী দূর থেকে জানায়, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাক। কথা না শোনায়, সে ঘোমটা টেনে এমন জড়সড় হয়ে বসলো, শত প্রেম নিবেদনেও আর মুখ তুলে চাইল না। তিনি কান পেতে শুনতেন তাদের ভাষা, তাদের ঘর-কন্যার কথা; তাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন, তাদের স্নেহ করতেন, আদর করতেন, সহানুভূতি জানাতেন।

আমরাও যদি সাইকেলের সংগে দুটো প্রাণের কথা বলি, তার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করি, একটু ভালবাসা জানাই, তাতে আপত্তির কি আছে?

হাঁ, যে কথা বলছিলাম, সপ্তসিন্ধু পরিক্রমার পরিচয়। দিল্লী-মেলা পরিদর্শন সমাপ্ত করে আজ চলেছি পঞ্চনদীর তীরে। তবে শিরে বেণী পাকিয়ে নয়—বেণীর সংগে শির দেওয়াই ওদের বৈশিষ্ট্য, তেমন বোকামি করতে আমরা কোনদিন চাই না।

দিল্লীর পথপ্রান্তে চলেছে দু-খানা দ্বিচক্রযান। নগরের ব্যস্ততা এখনও আসেনি, সামনে দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত কাশ্মীরী গেট। অধিকাংশ নাগরিক আধ ঘুম, আধ জাগরণে শয্যায় বিরাজ করছেন। শুয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না, উঠতেও ইচ্ছে হচ্ছে না, উস্‌খুস্ করে পাশ ফিরছেন। কেউবা রাত্রের অত্যধিক উত্তাপজনিত অনিদ্রার ক্ষতিপূরণ করছেন ভোরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।

ক্ষীণতনুভারে চক্রযুগল এগিয়ে যায়, কাশ্মীরী গেট অতিক্রম করে। প্রথমেই পড়ে ডালহাউসি স্কোয়ার। মনে পড়ে যায় কলকাতার কথা, জনগণ-বিপর্যস্ত ডালহাউসি, শতোত্তর-চতুশ্চত্বারিংশ-ধারা-জর্জরিত ডালহাসৌ, তদুপরি নিরাপত্তা রক্ষায় সদা-শংকিত নগর-কোটাল আর দিল্লীর ডালহাউসি স্কোয়ার নির্জন স্থান, জন-মনুষ্য-শূন্য, শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে। তারপর মেডানস হোটেল। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর আদর্শে ছ-পয়সার খানা পাওয়া গেলে কেউ এর নাম করত না—এর আদর্শ সম্পদে-গাম্ভীর্যে-আভিজাত্যে। বড বড কংগ্রেসসেবীরা এই হোটেলটি বেশী পছন্দ করেন। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে যাঁরা জড়িত, শ্রেষ্ঠতম হোটেলে ওঠাই তাঁদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়— গান্ধীবাদী বলে কংগ্রেসের আভিজাত্যকে তাঁরা পথের ধূলায় বিসর্জন দিতে পারেন না!

ওল্ড দিল্লী ধরে এগোতে এগোতে আসে ওল্ড সেক্রেটারিয়েট; ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ—দিল্লীর একমাত্র মহিলা কলেজ। ভয় হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার, এই জিগীর তুলে ছাত্রীবৃন্দ সত্যাগ্রহ না করে বসেন? দিল্লীর পথে পথে না প্রতিধ্বনি তোলেন, পুরুষের কি পক্ষপাতপূর্ণ শাসন! এই নারী-প্রগতির যুগেও তাঁরা দলিতা, লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা! নয়া দিল্লীর এত বিস্তৃত এলাকা, অথচ তাঁদের এতটুকু ঠাঁই হয় না! ভাবছিলাম, নারীদের রক্ষা-সমিতি কি রাজধানীর চাকচিক্যে ভুলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করছে!

ডান পাশে 'খাইবার পাস'। নাম শুনে খুব আশান্বিত হবেন না—সেটা গিরিপথ নয়, সেখানে খাবারের পারমিটও মেলে না; সে একটা সাধারণ গলি। সাইকেল চালাতে পদযুগলের যা শক্তি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বুঝলাম, ব্রিজের পাশে এসে পড়েছি। সাইকেল ঠেলে চড়াই ভাঙার কালে মনে-হয়, নব বধূর লজ্জা ভাঙানও এর তুলনায় সহজসাধ্য, অথচ চড়াই-উৎরাই-এ কোথা সে আনন্দ-শিহরণ?

বন্ধু কানুকে নিয়ে হয়েছে আর এক বিপদ, বিশেষজ্ঞ থাকলে যে অবস্থা হয়। চিনিমাখান থাকলে কুইনিন খাওয়া বিশেষ দুঃসাধ্য নয়, উৎকট কবিরাজী পাঁচন, তাও সহ্য করা যায়, কিন্তু পাণ্ডিত্যের বদহজম, মানুষকে পাগল করে ছাড়ে। গহ্বরের মহাকাব্য শ্রীকান্তকে চোখের জলে, নাকের জলে করেছিল; বন্ধুর জ্ঞানগর্ভ তথ্য যে আমার মাথায় রক্ত চড়িয়ে দিত, তা আর কি করে বোঝাই? তবে অংশীদার হলে হাড়ে হাড়ে বুঝবেন।

বলে—মনে পড়ছে হিউয়েট আর নিকলসনের কথা, মেজর জেনারেল নিকলসন……।

চাপা দেবার চেষ্টায় বৃথা কাল হরণ করি, আজে বাজে কথা পাড়ি—দিল্লী ছাড়ার সময় মনে পড়ার অনেক কিছু আছে, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, ফিরোজশা কোটলা, নিজামুদ্দিন, সফদরজং, কুতুবমিনার, জয়পুর থেকে আনা যন্তর-মন্তর। তাছাড়া আছে, বৃটিশ-সৃষ্ট বীথিকা, ব্যারাক আর ব্যায়রাম।

—সে আবার কি?

—কেন, নয়াদিল্লীর রাজপথ বড় বড় গাছের সারি দিয়ে ঢাকা, যেন সে বন-বীথিকা। সহরের চারু অংগে ব্যারাকের বিচিত্র বাহার, কোনটা "L" আকারের, কোনটা পেটকাটা "E" আর কোনটা বা চতুর্ভুজ। চাকরীর গ্রেডের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কোয়ার্টারের মান নির্ণয় করা যায়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে হবু জামাই-এর দৌড় জানতে নাস্তানাবুদ হবার প্রয়োজন নেই, বাড়ীর ঠিকানা থেকেই চাকরীতে তার সামাজিক মান সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরও বাঁচোয়া, ভব্যতাশূন্য অভদ্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করার ক্ষেত্র থাকবে না, লজ্জায় রক্তাভ হবার প্রয়োজন হবে না। মাথা চুলকিয়ে, দু-বার ঢোক গিলে, বলতে হবে না, মাইনে……এই সামান্য……।

কি বিচিত্র এই পুরী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, কি ওয়েল ডিসিপ্লিনড—পরস্পর পরস্পরের প্রতি কি সহানুভূতিসম্পন্ন। কেরানীকুলকে অ্যাসিসট্যান্টগণ

নিতান্ত অনুকম্পার চোখে দেখেন—সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট হলেন ইভলিউশন স্তরে শেষ ম্যামেল, প্রাণীতত্বে এঁরা পরিপূর্ণ মানুষের সমকক্ষ; অফিসারী ধাপ ধরে ফেলেছেন প্রায়। আর পদবীতে যাঁরা সাহেব অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যাদের বলে অফিসার, তাঁবা জাতিতে ব্রাম্‌হ্ণ, দেবলোকে ইন্দ্রতুল্য। সেই স্বর্গরাজ্যেও শ্রেণীসংগ্রাম আছে—ফার্ষ্ট ক্লাস অফিসার, সেকেণ্ড ক্লাস অফিসার, থার্ড ক্লাস……। পৈতে থাকলেই ত সবাইকে প্রাণ খুলে আলিংগন করা যায় না। লক্ষ্মণ সেনের কৌলীন্য প্রথাকে না হয় সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট বলে স্বীকার করলাম, তাই বলে ব্রাম্‌হ্ণ বৈশ্য কখনই এক নয়, মনুও সে বিধান দিতেন না।

কালীবাড়ী আছে, বাঙালী যাত্রীর বড় সম্বল—সমুদ্রের মাঝে খড়কুটো ধরেও প্রাণরক্ষার একটা অনেষ্ট অ্যাটেম্প্‌ট নেওয়া যেতে পারে। এদের সকলকে ছাপিয়ে আছে বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। ভারতের শ্রেষ্ঠতম মন্দিরের অন্যতম—শুধু শিল্প বা সম্পদে নয়, আত্মগরিমায়ও। এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ। যাঁব মধ্যে খুঁজে পাই যীশুর আত্মদান, বুদ্ধের আদর্শ—ত্যাগ, সেবা, আত্মনিবৃত্তি। রাজধানীর মর্যাদা বজায় রেখেই দাঁড়িয়ে আছে, মণি-মাণিক্য-খচিত মন্দির —মহামহিম, উন্নতশির। তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, কবির প্রেরণায় যেন মূঢ় ম্লান মূক মুখ পায ভাষা, বলে ওঠে—আমার মাথা উন্নত করে দাও হে তোমার চরণামৃত বলে। অর্ধনগ্ন ফকির, দরিদ্র ভারতের মূর্ত প্রতীক, আড়ম্বরের চিরবিরোধী জাতির জনক বুঝেছিলেন, অর্থ হল পাপের বোঝা, যত ক্ষয় হয় ততই ভাল—মত ও পথের চুলচেরা বিচার সর্বক্ষেত্রে চলে না। তবে মন্দ লোকে বলে, এ মন্দির নাকি সাম্প্রদায়িকতা দোষেও দুষ্ট—এর বিচিত্র চিত্রসম্ভার দোল দিয়ে যায় মনে।

এই আদর্শহীন সমালোচকদের নিয়ে আর পারা গেল না—কুসুমে কীট দেখেই ওরা অভ্যস্ত—ওদের জীবন-দর্শন খালি অকথ্য-কুকথ্য ভাষায়

ভরা—সব মূর্তিমান মিস মেয়ো। ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন, প্রাসাদগুলোও এদের চক্ষুশূল। এই যে সব স্তম্ভ-প্রাসাদ-মিনার-তাজ, এই যে মণি-মাণিক্যের ঘটা, ইন্দ্রজাল-ইন্দ্রধনুচ্ছটা, দেশ বিদেশের টুরিষ্টরা যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়—বলে, কি অদ্ভুত সৃষ্টি, কি অপূর্ব স্থাপত্য, তাদেরও নিষ্কৃতি নেই। কুকথায় পঞ্চমুখের দল গলাবাজি শুরু করবে, জোর-জবরদস্তি করে বলবে—এর অধিকাংশ ফোরস্‌ড লেবার দিয়ে গড়া, বিনা পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র দক্ষিণায় দিনের পর দিন কাজ করতে বাধ্য হয়েছে দীন-মজুরের দল—তাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়েছে এই ইন্দ্রপুরী, গগনচুম্বী বিজয়স্তম্ভ, সুরম্য প্রমোদ-নিকেতন। সহানুভূতিশীল মন নিয়ে বিচার করলে তা আজও অনুভব করা যায়, তাদের অসহায় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আজও তারা শুনতে পায়।

দুর্ভাগ্য আমার, বন্ধুর আধিপত্যকে খর্ব করা গেল না। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরীতে তাকে অবহেলা করব কি করে?

ভেবেছিলাম হয়ত বলবে, এই হ্যাকনীড ফ্রেস দিয়ে আর আজ জনসাধারণকে ঘায়েল করা যায় না, কিন্তু ও ভিন্নপথ ধরে বলে, ইংরেজ আমাদের সম্রাট—বাপ-ঠাকুরদার আমলেও ছিল—ওদের জয়গান ভিন্ন অনুষ্ঠান পূর্ণাংগ হয় না। এখন যে পথ দিয়ে চলেছি, একশ বছর আগে বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। রিজ আর কাশ্মীরী গেট ছিল দুই শত্রু-সেনার সীমারেখা—রিজে ইংরেজের শিবির আর বিদ্রোহী সেপাইদের কেন্দ্র দিল্লী। মেজর জেনারেল হিউয়েট ঠিকই করেছেন, ব্লাডি নিগার ইণ্ডিয়ানদের ঠাণ্ডা রাখতে গেলে কড়া মুগুর না হলে কি চলে? মীরাট সেনানিবাসে মাত্র ৮৫ জন ভারতীয় সৈন্যকে লাঞ্ছিত করেছিলেন, না হয় প্রকাশ্য স্থানেই হল, তাই বলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

শান্ত মধুর রজনী। বেরসিক সেপাই শান্তিভংগ করল—ইংরেজদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্রুত তালে বাজিয়ে চলল, ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক। রাত

না পোহাতে তারা এল দিল্লী। নিরীহ ব্যাচারী বাদশা বাহাদুর শাহকে ফেলল বিপদে। কোন অজুহাত শুনবে না, তাঁকে নেতৃত্ব করতে হবে—সমগ্র ভারত আজ যে জেগে উঠেছে স্বাধীনতার মন্ত্রে।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে, এ ধারণা থাকলে নিশ্চয় ইংরাজ খোঁচা-খুঁচি করত না। কিন্তু এখন উপায়? সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু, তাকে ত্যাগ কবতে হবে? জাহাজে পাল খাটিয়ে কাল গুনছে পালাবার আশায়। কিছু প্রাণ বিসর্জন না হলেই বা সাম্রাজ্য ছেড়ে পালায কোন লজ্জায়, দেশে জবাবদিহি করতে হবে। এমন সময় পান্জাব থেকে 'প্রাজী' এসে পিঠ চাপড়ে দিল, বন্ধু আমি ত আছি? দেশীয় রাজারা তাদের প্রাজীপ্রবর, কতকালের ভাই। এবার দোসর কাশ্মীরী এল, এল গুর্খার দল—এল সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ। এখন একটা একস্পেরিমেণ্ট করা যায়, নিকলসন নিলেন নেতৃত্বেব ভাব। আর এদিকে বখৎখান সেপাইদেব খাইয়ে দিলেন, দেশপ্রেমের এক ডো'স সেঁকো বিষ। দুপক্ষই আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত কেবল দিল্লী-প্রাচীব উভযের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাজিনো লাইন হয়ে!

হঠাৎ রাত্রের অন্ধকারে বিকট শব্দ করে ভেঙে গেল কাশ্মীরী গেট। গোলাগুলির হাট-বাজাবের মধ্যেও কয়েকজন বিস্ফোরক দিয়ে অগ্নি সংযোগ করে এল। প্রাচীর ভাঙল, না ভারতীয়দের মাথায় আকাশ ভাঙল। এত রাত্রে কোথায় পাবে সৈন্যদল, তারা যে নির্বিবাদে সুখস্বপ্নে মগ্ন। রণ-দামামা শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে। তবে প্রথম আঘাতেই অর্ধেক জয়, অবশিষ্ট ফিপ্‌টি পারসেণ্ট নিকলসন জীবনের বিনিময়ে পুরিয়ে দিলেন। ইংরাজ উৎসব সুরু করে দিল—ধর, মার, ফুর্তি কর।

ব্যাচারা বাহাদুব শাহ ভাবছে ঘরে বসে বসে, কি প্রয়োজন ছিল এত হাংগামার; এখন উপায়? দ্বারে করাঘাত শুনে ভাবেন, কোন উর্দ্ধী এমন অসময় এসে হাজির হয়? আশ্বস্ত হলেন, বখৎ খানকে দেখে। তাঁর মুখে

আশ্বাসের বাণী—রাতটা পোহাতে দিন, দিনের আলোয় সৈন্যদের মিলিত করতে পারলে······ইংরেজকে সাগরপারে পাঠিয়ে দেবো।

তারপরই নবাবের দরবারে এলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মির্জা ইলাহি বক্স; নিরাপদে পালাবার পথ করে দেবেন। মির্জা সাহেবের লেফটে-নেণ্ট রাজীব আলী গেলেন ইংরেজকে ডেকে আনতে, তাঁরা পরস্পর মিলিত হলেন হুমায়ুনের সমাধি ভবনে। রাজা সপরিবারে বন্দী হলেন। তাঁর ভাগ্যে আছে পেনশন-রূপ সম্পদ, হাতে বিদেশ যাত্রার রেখাও সুস্পষ্ট। তাই বার্মামুল্লুকে গিয়ে সুখে বাস করতে লাগলেন।

নবাবের ছেলেরাও যাতে দুঃখ কষ্ট না পায়, তার সুব্যবস্থা হল। ছেলেদের কষ্ট স্বীকার করে বেশীদূর যেতে হল না, দিল্লীগেটের নিচে দাঁড় করিয়ে উপহার দেওয়া হল দুটি সৌজন্যপূর্ণ গুলি।

* * *

লিখতে বসে আজ মুখবন্ধে সবিনয় নিবেদন জানাই—বিনয়ে নিশ্চয় ঔদ্ধত্যের আঁচ লাগে না। 'মুই কোন ছার'ও বলছি না যে বৈষ্ণব বিনয় বলে কটাক্ষ করবেন। আমার বক্তব্য, কোন ভারতীয় পর্যটক, সুদূর ভবিষ্যতে এমন দ্বিচক্রযানের যাত্রী হয়ে, সমগ্র পান্‌জাবকে পদদলিত করতে পারবেন না।

এতবড় ভবিষ্যৎবাণী করার সাহস আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসূ নয়, তার কারণ আজ সে পান্‌জাব নেই, এখন পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করা হয়েছে, মাঝে পড়েছে প্রাচীর, তা লৌহযবনিকার চেয়ে মারাত্মক। দুই বিভিন্ন ভগ্নিরাষ্ট্রের সভ্য এরা। অবশ্য কাগজে-কলমে এরা মাঝে মাঝে হয় 'হাত আর দস্তানা', কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা, এরা পরস্পর আদা আর কাঁচকলা। হয়ত বা কিপলিং মহাপুরুষ ছিলেন, নাহলে কি নির্ভুল গণনা করতে পারেন, ইষ্ট ইস ইষ্ট, ওয়েষ্ট ইস ওয়েষ্ট এণ্ড দি টোয়াইন শ্যাল নেভার মিট!

রাজনীতি যাদের পেশা এবং নেশা, তারা এসব ঘটনাচক্র নিয়ে আসর জমাক। আমরা ছাপোষা মানুষ, বাপ-দাদা চিরকাল সাহেবী কারবারে মাছি মেরে এসেছে, সকল কথায় ইয়েস স্যার, ইযোর অনার বলেছে, বছরে তিনটাকা ইনক্রিমেণ্ট পেলে জোড়াপাঁঠা কালীঘাটে দিয়ে এসেছে; ভগবানে আমাদের অগাধ বিশ্বাস—সবই মংগলময়ের ইচ্ছা—মা ব্রম্হময়ী তারা!

এই প্রসংগে আর একটা কথা জানাই, ইংরেজ কি জানি কেন, বাঙালীর হাতে অস্ত্র দিতে সাহস করেনি; তা ইংরেজের বাঙালী-ভীতিগ্রস্থ বলে যা প্রচারিত, স্রেফ প্রপাগ্যাণ্ডা। সে আত্মম্ভরিতার অসারতা প্রমাণিত হল ১৯৪৬ সালের ডিরেক্ট একশনের সময়। টি-টি পড়ে গেল সারা ভারত; সর্বভারতীয় নেতারা পযন্ত আনব্যালেন্সড হয়ে পড়লেন, তাই স্নেহের শাসন করলেন; বললেন, বাংলার হিন্দু করবে যুদ্ধ, আত্মরক্ষা! বাঙালী শুধু কাঁদতে জানে!

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম যুগ থেকে এরা ইংরেজের কাছে মার খেয়েছে! চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে গিয়ে মার খেয়েছে! ৪২ সালে মেদিনীপুরে চরম মার খেযেছে! প্রাচ্যে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে মার খেয়েছে! নোযাখালি কেন, সমগ্র পূর্ববংগে যে মার খাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এই দুর্দিনে ভারতকে কে রক্ষা করেছে? কৃপাণধারী শিখ। পাঁইজী বলতে দেশবাসী অজ্ঞান—এই কথাটার মধ্যে যেন শৌর্য-বীর্য ঝরে পড়ছে। হিন্দুর ভারতকে যদি বাঁচাতে পারে, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর প্রাণে যদি নবজাগরণ আনতে পারে, তবে তা শিখের দ্বারা সম্ভব। কলকাতার পথে-ঘাটে দেখি, বাঙালী ছেলের কেশ আর দাড়ি গজিয়ে গেল, মাথায় চড়ল পাগড়ি। বিহারে দু-হাজার হিন্দু একদিনে শিখধর্ম গ্রহণ করল—জাতিকে বাঁচতে হলে, কৌপীন ছেড়ে কৃপাণ ধরতে হবে।

সেই বীর জাতি এই সাম্প্রদায়িক নরমেধ যজ্ঞে নষ্ট হয়ে গেল। অগণিত

শিখ অসহায়ের মত মৃত্যুবরণ করেছে, লাঞ্ছিত-উৎপীড়িত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সবাই বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। হায়! ভারতের রক্ষাকবচ সাময়িক ভাবে অপবিত্র হয়ে গেল—গংগাস্নান করিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যেন করতে, না জানি কতদিন লাগবে!

* * *

দেশটা দেখার আগে সাধারণ লোকের মত আমাদেরও ধারণা ছিল, পান্‌জাবটা শিখের রাজত্ব। ওখানকার সবাই পাগড়িওয়ালা, মাথায় থাকবে ঝুঁটি, গালে এক গাল দাড়ি। আসলে সামান্য কয়েকটি কেন্দ্র শিখ-প্রধান। সমগ্র পান্‌জাবের শতকরা মাত্র ১৩ জন শিখ, মুসলমানের সংখ্যা ৫৭ এবং হিন্দু ২৮ জন। লাহোর পান্‌জাবের রাজধানী, সেখান থেকে শুরু হয়েছে বিভেদ। পূর্ব প্রান্তে হিন্দু-প্রাধান্য, লাহোর থেকে যতই পশ্চিমে যাওয়া যায়, ততই মুসলমান-প্রাধান্য; পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শতকরা ৯০ই জন মুসলমান।

বেলা এগারটা হবে। সূর্যদেব বেশ বিক্রম জানাচ্ছেন। দিল্লী থেকে মাইল চল্লিশেক দূরের এক গ্রামে দুপুরের মত আশ্রয় নিলাম। মাত্র একটি ধর্মশালা শিবরাত্রির সলতে হয়ে জেগে আছে। তারই শরণাপন্ন হতে হল। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এর সর্বাংগে; ছাই-এর মধ্যেও নাকি অমূল্য রত্ন পাবার সম্ভাবনা থাকে।

চারু অংগে চন্দন প্রলেপের ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কয়েকখানা আধ ভাঙা চারপাই। রামা-শ্যামা থেকে রাধা-মাধব প্রত্যেকে যে-কখানা পেয়েছে টেনে নিয়েছে, নিজস্ব বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। নানা যাত্রী সংগমে এই চারপাই নিয়ে খুন জখম হয়েছে, তেমন রেকর্ডও অনেক পাওয়া যায়। দরকার নেই ভোগের মোহে ঘুরে, বেঁচে থাক আমার ভাঙা বাঁশী; তাই নিতান্ত অবহেলার পাত্র হয়ে যে দু-একখানি পড়ে ছিল, তাই আশ্রয়

করলাম। বাংলাদেশে এ শেষ যাত্রার আশ্রয়, বর্তমান ক্ষেত্রে খাটিয়াকে সংকার করার সময় হয়েছে, তা বেশ উপলব্ধি করলাম।

অতঃপর 'অন্নপূর্ণা'র উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত হলাম। যে আশ্রয়ে গতি রুদ্ধ হল, তার নাম ডাব্বা—গাব্‌দা-গোব্‌দা খানা তৈরী করে বলে কি, সামঞ্জস্য রেখে এরা হোটেলের নামকরণ করেছে? মিহি হতে মিহিতর চালের সন্ধানে ফিরি চিঁহি বাঙালীরা। আটার প্রতি প্রীতি কস্মিন কালেও আমাদের নেই। বরং ওদের আটা দিয়ে তৈরী খাবারের ঘটা দেখে মনে আতংক জাগে, ওদের ঘরে সশ্রদ্ধ সংকার লাভ করার চেয়ে ম্যালেরিয়ার অনুগ্রহভাজন, একথা প্রমাণ করে দু-দিন মুড়ি খেয়ে মুড়ি দিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু সে রুটির কথা ভাবলে, আজও শংকা জাগে মনে। সে যে শুধু বাংলাদেশের ফুল্‌কো রুটি নয়—ফুল্‌কা, তন্দুরা, টক্কর-মক্কর……বিভিন্ন এবং বিভীষিকাময় আকার ও প্রকারের রুটি।

পান্‌জাব যাবার আগে লোকে বলেছিল, দেখবে পথের ধারে ফলে রয়েছে অজস্র আপেল, সেও, আখরোট; আঙুরের লতাকুঞ্জে ভরে আছে চতুর্দিক, খুশিমত পেড়ে নাও। খেয়ে চলে যাচ্ছ দেখলে, তারা স্নেহের শাসন দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে আনবে, ছাঁদা বেঁধে নিলে তবে রেহাই। সে নন্দনকাননের সন্ধান পেলাম, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে পাহারারত সশস্ত্র জয়-বিজয়কে। ফলের সন্ধানে ফিরলে তারা সড়কি বাড়িয়ে তেড়ে আসবে, তখন মানের সংগে প্রাণটাও না দাবী করে বসে। বাগানের অধিকাংশ সরকারের সংরক্ষিত ফলের বাগান।

কলকাতা থেকে ফল সস্তা এইটেই বড় কথা নয়, আসলে এদেশের লোকেরা খুব ফলভক্ত। মাছ আর ভাত না হলে বাঙালী মনের সংগে পাত পাড়বে না—ছাতু-গুড় না পেলে বিহারীরা খৈনি খাওয়া ভুলে ছুটে আসবে, সেলাম জানিয়ে পরিবর্তনের দাবী পেশ করবে—সকালে উঠে পুরী আর গরম গরম জিলিপি যদি না পায়, যুক্তপ্রদেশবাসীর যুক্তিবিহীন হয়ে

পড়ার সম্ভাবনা থাকে—লংকা, তেঁতুল অমিল হলে তামিলদের দিন অচল; তেমনি পান্‌জাবীদের ফল না পেলে মনে হবে, দিনটি বিফলে গেল।

পানিপথ

ছোটবেলায় কত মুখস্থ করেছি পানিপথের কথা। এক নম্বর যুদ্ধ, দু-নম্বর, তিন নম্বর। পরীক্ষার আগে বইতে ইম্পরটেণ্টের আগে অনেকগুলো ভি-ভি বসে যেত—ভি ফর ভিকট্রি নয়, এটা শুভ মাংগলিক চিহ্ন, পরীক্ষার আগমন-দ্যোতক। তবে বিপদ বাধাত, কোন যুদ্ধে কোন মহাপ্রভু জাতির শান্তি রক্ষা করেছিলেন, তাই নিয়ে। স্থানীয় লোক এবিষয়ে অত্যন্ত প্রখর, শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে—যুদ্ধ? বাপ-ঠাকুরদার আমলেও কেউ দেখেনি। ও, মনে পড়ছে, হয়েছিল বটে ইংরাজ সৈন্য আর দু-দশজন শিখ মিলে, সে কি ভয়ংকর যুদ্ধ—সেই কথা বলছেন কি?

বলি—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই কথাই বলছিলাম।

মনে পড়ে গেল এক পর্যটকের কথা। তিনি চলেছেন মিলটনের বাড়ী দেখতে, নেমেছেন বাস থেকে, এখন কোন পথে যাবেন? একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই পাশ থেকে এক স্থানীয় জমাদার বলে, ও! দি গ্রেট পোয়েট, অথর অফ প্যারাডাইস লস্ট—ডানদিকে যান, প্রথম রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে, সামনেই পাবেন বাগান বাড়ী। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ইংলিশম্যান ইস ইংলিশম্যান, তাদের গুণকে অস্বীকার করা চলে না।

চায়ের সন্ধানে ফিরছি, পেছন থেকে ডাক পড়ল—মিষ্টার······হ্যালো মিষ্টার। এমন সসম্ভ্রমে এই মুলুকে ডাক পাড়বে কে? পিছু ফিরে দেখি, আমরাই তার সাদর সম্ভাষণের উপলক্ষ। এমন উপযাচক হয়ে আত্মীয়তা, সামান্য ঘাবড়ে গেলাম, তবে কি বহুরূপী রাজপুরুষ জাল বিস্তার করল, শুনেছি তাদের নাকি এমনই টিকটিকির মত আকৃতি হয়?

সে কথা চিন্তার অবসর পেলাম না। তার পরবর্তী কথাগুলো ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ বলা যায়, প্রায় সবই নতুন কথা; অমন দু-চারজন জ্ঞানী পুরুষ থাকলে শব্দ-সম্ভারে ইংরাজী সাহিত্য জ্বল জ্বল করবে। কিন্তু আমরা অভাজন, তাই ভাবি, কথাগুলো বোধহয় ল্যাটিন, গ্রীক বা হিব্রু। শেষে বলি, আমাদের ঘরোয়া আলোচনার জন্যে ভাষার ক্ষেত্রে বিদেশীর দ্বারস্থ না হয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রভাষায় চালালে কেমন হয়? সেকথা শুনে সানন্দে রেষ্টুরেণ্টে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাল। পরবর্তী অনুষ্ঠান, পরিচয় পত্র বিনিময়। পরে বুঝেছিলাম, দু-পক্ষই মানুষ চেনার ব্যাপারে পণ্ডিত, বড় সাইকিয়াট্রিষ্ট। তার পরিচয়, গত মহাযুদ্ধে পরিবহন বিভাগের সারথী হয়ে ইয়োরোপের সর্বত্র ঘুরেছে। সেই দৌলতে আয়ত্ত করেছে সার্বজনীন ভাষা। বিশ্বরূপও সে দর্শন করেছে—ইটালীর আউরৎ নাকি দুনিয়ার সেরা সম্পদ!

এমন লোকই মহাপ্রাণ হয়। আমাদের চায়ের বিলটি তার উদারতা প্রকাশের প্রথম সুযোগ দিল। বলে, তোমরা বাঙালী, জানি ভাতের ভক্ত, এদের আদেশ দিয়ে যাই, চাবল রেঁধে রাখবে……চাবলের খরচ দিয়ে গেলাম। তারপরও আমাদের সেবা করার সুযোগ খুঁজতে সে শশব্যস্ত।

পানিপথ প্রদক্ষিণ শেষ হল, এবার কি করি? উঠল খেল্ দেখার হুজুগ। হুজুগে বাঙালী বলেই তার বরাতে অশেষ দুর্ভোগ। কলকাতায় মিড-নাইট শো পালা-পর্ব বেছে দু-একদিন হয়, এখানে প্রত্যহ। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে পরিশ্রান্ত, তায় খেল্ শেষ হতে নিশিভোর হবে, তবু বোধ-হয় নবলব্ধ বন্ধুকে এড়াবার সুযোগ না পেয়ে সিনেমা দেখাই সাব্যস্ত হল। প্রসংগক্রমে বলা যায়, চিত্রতারকাদের শ্রীমুখ-নিসৃত গুরুমুখী, আমাদের গুরু-মশাইরাও উদ্ধার করতে পারতেন না।

সিনেমা সাংগ হল। চোখজোড়া বড় অবাধ্যের মত টেনে ধরেছে, অর্ধ-নিমীলিত নয়নে ধীর পদক্ষেপে চলেছি, পড়ব কি মরব এই অবস্থা।

বন্ধুর সহ্য শক্তি অপার, তাই নবলব্ধ বন্ধুটির সংগে তখনও ভাব বিনিময় চালিয়েছে।

সে বলে—চলো না আমার বাড়ী, বেশ আনন্দে রাত কাটান যাবে! তখন আমি ভাবছিলাম, দেশের মাটির দু-হাত পরিমিত স্থানে চিৎ হতে পারলে, পর মুহূর্তে হব সচ্চিদানন্দ—গভীর শান্ত নিদ্রা।

চড়াক করে ঘুম ছুটে গেল······বহুত আচ্ছা আউরাৎ······গানাভি জানতা······বহুৎ খাপসুরৎ······ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন ঘটকঠাকুর ভাবী বৈবাহিকের কাছে কলাবতী কন্যার বহুবিধ গুণপণার ফিরিস্তি আউড়ে চলেছে। মনে হল, ইতিমধ্যে কানু যেন ঘুসি পাকিয়ে ফেলেছে, রাত-দুপুরে বিপদ না বাধায়? তার ইনভেষ্টমেণ্টের টোটাল লস, আক্রোশ না হওয়াই অস্বাভাবিক?

বলি—আরে তাই নাকি? আগে বলতে হয়? এ কত আনন্দের কথা, পরম সৌভাগ্যের কথা; তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হল। আজ বড় পরিশ্রান্ত, রাতও শেষ হয়ে এল······।

সে আর একবার আমাদের মনে নোঙর ফেলার শেষ চেষ্টা করে।

ইন্দ্রসভায় উর্বশীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার মত দুঃসাহস আমার নেই, তবে নিজেদের অপ্রয়োজন সম্বন্ধে বেশ অবহিত।

কর্ণাল

পানিপথ থেকে কর্ণল একুশ মাইল পথ। করণকা তলাও থেকে এই নামকরণ। এই 'করণ' হচ্ছেন মহাভারতের মহাবীর ও মহাদাতা কর্ণ। যিনি অকল্যাণকর সামাজিক গোড়ামির শাশ্বত প্রতিবাদ। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন নিয়েই এ গৌরবান্বিত। তবে আজ স্মৃতিটুকুই সার, কর্ণের ধর্ম গেছে চুলোয়।

স্কুলের সন্ধানে ফিরছি আশ্রয়ের আশায়, হতাশার সংগে শুনতে হল, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ; দু-একদিন হল ওদের গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়েছে। অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি গরমের ছুটি? এখানকার সাথে বাংলাদেশের গরম পড়ার তেমন তারতম্য হয় না, তবে এ পার্থক্য কেন? এ কেমনতর বিবেচনাহীন ব্যবস্থা? স্কুল-কলেজ খোলা থাকলে, দাতাকর্ণের সুনাম বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকত। আর যাই হোক, ঘৃত-তৈল-তণ্ডুলের খোঁজে এতখানি নাস্তানাবুদ হতে হত না, তাই আমাদের এত গাত্রদাহ।

এক স'রাতে গিয়ে উঠলাম। ভাবছেন হয়ত, সে আবার কোন গোলকধাঁধা? না তেমন বিচিত্র কোন স্বপনপুরী নয়—কেবল ভাষার মারপ্যাচ, এ হল, আমাদের ভাষায় যাকে বলে ধর্মশালা। ধর্মশালার তত্ত্বাবধানে যাঁরা থাকেন বোধহয় প্রকৃতই ধর্মের শ্যালক। লক্ষ্মীবিহীন নারায়ণ তাঁরা ভাবতে পারেন না, হর-পার্বতীর বিরহ সইতে তাঁরা নারাজ, তাই 'পদ্মপলাশ-লোচনে' কেউ সাথে না থাকলে তাঁরা ঘর খুলে দেবার প্রেরণা পান না। স্বয়ং কার্তিকেয় এলেও তারা গা নাড়া দিয়ে বসবে না। ললনাবিহীন ভবঘুরেদের ভোগে দেবার থেকে বরং ভাল ভাল ঘরে আর একটা তালা এঁটে দিতেও প্রস্তুত। আরও হয়, মুদ্রার নৈবিদ্য যদি তাঁদের বাম-করে নিবেদন করা যায়, মন গলতে পারে। কিন্তু এই যুগপৎ ধর্মে আমরা পতিত। তাই নিচের এক অন্ধকূপ খুপরি পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলাম। তবে ভাগ্য কোন দিন আমাদের বঞ্চিত করে না, পেয়ে গেলাম মঞ্জি—নামটা কেমন শ্রুতিমধুর, যেন আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে ওর সর্বাংগ দিয়ে, অথচ চারপাই শব্দটা কত কাঠখোট্টা।

ধর্মশালার পেছনেই বিরাট পুকুর, যা এখানে সচরাচর দেখা যায় না। এইটেই বিখ্যাত করণকা তলাও।

* * *

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরছি, মাঝপথে গতি রুদ্ধ হল, কর্ণকুহরে ঝংকার তুলল বিশুদ্ধ ইংরাজী গান। আরও এগিয়ে শক্ খেতে হল, আমাদের সদ্য আবিষ্কৃত গায়ক, ল্যাক-প্যাক-সিং আকৃতি নিয়ে পালোয়ানী কৌপীন এঁটে বসে আছে। একি গান্ধীজীর সাক্ষাৎ শিষ্য, না মস্তিষ্কের সেরিবেলাম গুলিয়ে গেছে, চন্দ্ররাজ্যে ঘোরা-ফেরা করেন?

কল্পনার ইলাষ্টিক দড়িকে আর টানতে হল না, তিনিই ডেকে পরিচয়ের পালা চুকিয়ে দিলেন। তারপর অন্তরের ভাব বিনিময় হল। শুনলাম তাঁর জীবন-স্মৃতি। ভাল শিল্পীর হাতে পড়লে, এই ঘটনার কাঠামো দিয়ে দ্বিতীয় রোমীয়-জুলিয়েট রচনা করা যেত। আমার অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে নিলেও মানতে হবে ঘটনাটি গতানুগতিক।

ভদ্রলোক রেলওয়েতে কাজ করতেন, সাহেবের সুনজরে পড়ে কিছু দিনের জন্যে তাঁকে প্রবাস-যাত্রা করতে হল। ফিরে এসে দেখেন, তাঁর ভালবাসার পাত্রী প্রেমের মর্যাদা অন্তরের মণিকোঠায় তুলে রেখে আর একজনকে জীবন-সাথী করে সংসার সমুদ্রে সংগ্রাম শুরু করেছে। সাধের সম্পদকে কোন বিলের চিল উড়ে এসে ছোঁ-মেরে নিয়ে গেল, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই; সৃষ্টি হল কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস।

শেষ পর্যন্ত উদোর পিণ্ডি চাপল বুধোর ঘাড়ে, রাম করল অপরাধ, বাড়ি পড়ল শ্যামের মাথায়। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললেন, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সেই যে পাড়ি দিলেন, তা খালি লম্বা নয় স্থায়িত্বেও বেশ দীর্ঘ। তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন ছন্নছাড়ার মত; আজ আমেরিকা, কাল আফ্রিকা, পরদিন ইয়োরোপ সর্বত্র কাগের বাসা বেঁধেছেন। মনের দুঃখে বনে না গিয়ে হলেন দি গ্রেট গ্লোব ট্রটার। বৃদ্ধ বয়সে ভারতে ফিরে এসেছেন শান্তির আশায়, কিন্তু এও এখন বুঝেছেন, সংসারে অশান্তির সামান্য মাত্র ক্লান্তি নেই।

সেদিন পথে যেতে যেতে কানু বলেছিল—নারীজাতি চিরকাল প্রেমে পুরুষের দুর্বলতাকে ভোঁতা বর্শা দিয়ে খুঁচিয়েছে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে। আসলে উচ্ছাসভরা ওসব জোলো হৃদয়াবেগে তারা ভেজে না। সোনার আপেলই চিরকাল তাদের মন হরণ করে এসেছে। নারীর মনের ময়ুর মেঘের আভাস পেলেই চম্পট দিয়েছে, পেখম তুলে কোন দিনই নেচে ওঠেনি।

বন্ধু বলেছে ভাল, যেন নারীজাতির মাথায় বিষোদ্গাবের একটা এনসাইক্লোপিডিয়া চাপিয়ে দিল। আরও মজা দেখার আশায়, ওর মন-মনসায় ধূনো ছড়াই—সেকস্পীয়রও তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র প্রমাণ করেছেন, ফ্রেলটি দাই নেম ইস ওম্যান।

কিন্তু হঠাৎ বন্ধু সপ্তম থেকে খাদে নেমে এল, সেকস্পীয়ব ছেড়ে ধরল বৈষ্ণব পদাবলী, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলম্বিত লয়ে গেয়ে উঠল—হায়! তাকে নিয়ে সংসারে আর ট্রয়ের যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। আজ হয়ত সে মহাসমারোহে উত্তর পুরুষ সম্পর্কধারী এক গোষ্ঠী ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আচ্ছা, এই বুড়োর কথা মনে হলে কি একটু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগে না? আহা! হৃদযবৃত্তিকে সামান্য শ্রদ্ধা জানালে, এই ছন্নছাড়ার জীবন ফলে-ফুলে ভরে উঠত!

বলি—অত আশা করা সাজে না। মারিচ-এর দশা নিয়ে পুরুষের জীবন; একদিকে রাবণ অস্ত্র উঁচিয়ে আছে, অন্যদিকে রাম; বিরহ আর বিবাহ দু-দিকেই সমান জ্বালা। শরৎচন্দ্রের 'সতী' বংকিমচন্দ্রের 'নয়নতারা' আর শ-সাহেবের 'এণ্ড্রক্লিস পত্নী' না হয় কবি কল্পনা, কিন্তু ঋষি টলষ্টয়ের জীবন, সে ত রূঢ় বাস্তব। স্ত্রীর সুমধুর সুধা বর্ষণে সে মহাপ্রাণ দুর্বিসহ হয়ে উঠত। কেন, সক্রেটিসপত্নী জ্যান্থিপির স্বামী-প্রীতি? সে কাহিনী কলহ সাহিত্যের অপূর্ব অবদান। আব্রাহাম লিংকনের জীবনেরও সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি গুলির আঘাতে মৃত্যু নয়, তাঁর বিবাহ।

আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে অন্য কথা—সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মিসেস আউঙ্ সাঙ্ থেকে রাণী, মহারাণী, প্রিন্সেস, ডাচেস, এমন কি ওপাড়ার খ্যান্তপিসি পর্যন্ত তাজমহল দেখার পর অকপটে জানিয়েছেন, যদি প্রতিশ্রুতি পান, তাঁদের সমাধির ওপর গড়া হবে এমন শুভ্র-সমুজ্জ্বল তাজমহল, অকাতরে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। আমাদের আলোচ্য প্রেমিক-প্রেমিকা যদি জানত, তাদের নিয়ে রচিত হতে পারে এক মহাকাব্য, এর থেকে বীরত্বব্যঞ্জক কিছু করে ফেলতে পারত।

*　　　*　　　*

বিষাদ-সিন্ধুতে হাবু-ডুবু খাওয়া সত্বেও তাঁর সংগে আরও অনেক গল্প হয়। চীনের ব্ল্যাক-ড্র্যাগন থেকে ব্লাড-ড্রিংকিং-সেরিমনি, এমন অনেক আজগুবী ও লোমহর্ষক কাহিনী তিনি বলেন। পাঠকগণের ওপর সে অত্যাচার না চালিয়ে, কেবল আমাদের প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, সেই বিষয়টা জানিয়ে এ প্রসংগ শেষ করতে চাই।

তিনি বলেন—ভারতবাসী মর্যাদাসম্পন্ন জাত, আত্মসম্মান জ্ঞান আমাদের টনটনে—সেখানে পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই, জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। যাদের মানের ঘরে ঢেড়া পড়ে আছে বা ওপরটা চকচকে, গিল্টি করা, ভেতরটা পুরোপুরি খাদ, মান যাবার ভয় তাদেরই বেশী।

পৃথিবীর সকল দেশ ডিগনিটি অফ লেবার স্বীকার করে নিয়েছে। বহু দেশে দেখেছি, প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারও সামান্য মজুরের সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করে খেত-খামারে। আমরা বৈষ্ণবের জাত, তাই ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা-বঁধু ভাব। ভারতবাসীর ধারণা, আমি না অমুক ঘরের ছেলে, আমার বংশ গৌরব সর্বজন-বিদিত, আর আমি করব এই ছোট কাজ! অথচ আমেরিকার মত ধনকুবেরের দেশে চেয়ে দেখুন, বড় বড় ঘরের ছেলেরা সকালে খবরের কাগজ বেচতে বেরোয়। জেনারেল আইসেন আওয়ার, জেনারেল ওমার ব্র্যাডলে, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রেড

জনসন, টম ক্লারক, গভর্ণর টমাস ডিউয়ি সবাই ছিলেন নিউস-বয়। সকাল না হতেই কাগজ বগলদাবায় পুরে ফেরি করতে বেরোতেন। আজও তাঁরা সেকথা সগর্বে স্বীকার করেন। স্কুল-কলেজেব দীর্ঘ অবকাশে, ফল কুড়োন আর ডিস ধোয়ার কাজ কবেনি, এমন ছেলেই বোধহয় ও-দেশে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা করতে গেলে নিজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করাই যুক্তিযুক্ত। নিতান্ত পাঠক অসন্তুষ্ট হবেন, না হলে উপদেশ-কথামৃত আর এক ভলিয়ুম দেবার বাসনা ছিল। তবে আমায় যদি বলে, কাজ দিয়ে কথার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে, সোজা উত্তব : ওসব বৃহৎ কাজে আমি নেই, প্রাতভায় এবং স্বাস্থ্যে আমার সমান অধিকার—টম ক্লারক বা সমরবিদ আইক কোন-টাই হতে চাই না; ভবিষ্যতে কেউ কনফেশনের রেফারেন্স টানবে, তেমন আশংকাও রাখি না। কায়িক ও মানসিক প্ররিশ্রম বাদ দিয়ে যা বল করতে রাজি আছি। মনের কথা আরও ভেঙে বলি, বেঁচে থাক আমার পঞ্চাশ টাকার কেরাণীর চাক্‌রী—মাছিমারা জিন্দাবাদ।

থানেশ্বর

পান্‌জাব রুক্ষ দেশ। এখানেও যে বাংলাদেশের মত প্যাচ-পেচে বর্ষা পড়তে পারে, সে ধারণা ছিল না। দিন নেই, রাত নেই, অবিরাম ধারায় চলেছে বরিষণ—এ যেন চেরাপুন্‌জির চেরা আকাশ। মেঘের যা ঘনঘটা, দু-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি ছাড়বে, সেকথা ভাবতেও কষ্ট হয়। আইনের ফাঁক পেলে অপরাধী যেমন সেই সূক্ষ্ম পথে রেহাই পাবার চেষ্টা করে, শশকরা শিকারী দেখলে যেমন ঝোপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, ভোরবেলা বৃষ্টি সবেমাত্র ধরেছে কি বেরিয়ে পড়লাম; বিন্দুমাত্র দেরী সইল না, আবার বৃষ্টি এসে পড়লে বেরোন হবে না, সেই ভয়ে।

আমাদের শয়তানী মতলব বোধহয় বুঝে ফেলেছিল, তাই সামান্য দূরে যেতে না যেতেই, দ্বিগুণ দাপটে এল বৃষ্টি। ভিজে জব-জবে হয়ে গেলাম।

গ্রাণ্ডট্রাংক রোড় ছেড়ে চার মাইল ভেতরে প্রবেশ করে পৌছলাম থানেশ্বর। দানবীর হর্ষবর্ধনের রাজধানীতে ট্র্যাডিশন এখনও বজায় আছে। আশ্রয়ের অভাব হল না, স্বাগত জানাল বাঙালী প্রতিষ্ঠিত গীতা-মন্দির। বাঙালীরা রামলীলার সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল অকালবোধন বরণ করে নিয়েছে জানতাম, তবে মহাভারতের গীতায় তার একাধিপত্য, একথা কোনদিন শোনার সৌভাগ্য হয়নি।

মহারাজ রাবণ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি গড়তে শুরু করেন, অনেকদূর এগিয়েও ছিলেন; রামচন্দ্র যুদ্ধ বাধিয়ে সৎকার্য সমাধান করতে দিলেন না। গীতা-মন্দিরে ওঠার সময় সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পায়ে পক্ষাঘাত ধরার উপক্রম; ভাবছিলাম, এ কি সেই রাবণের গড়া ধর্মবিরোধী কাজের প্রমাণ স্বরূপ বিরাজ করছে?

গীতা-মন্দিরের সামনে আছে এক বিরাট-আকৃতি ছবি, পার্থ-সারথী রথের চাকায় তেল না দিয়ে অর্জুনকে শুধু নীতিসুধা বর্ষণ করে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করছেন। এদিকে ঘোড়ার যা গতিবেগ, নিশ্চয় পথে ট্র্যাফিক প্রবলেম ছিল না; তাহলে পাঁচ আইনে পড়তেন কিনা, কে জানে?

যেখানে আস্তানা গেড়েছি, সে হল হিন্দু মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠান। এদের ক্ষমতা বৃহৎ না হলেও উদ্দেশ্য মহৎ। যাঁরা অতীতে খেলার ছলে ধর্মের বেড়া গ্যালপ করে ভয়াবহ পরধর্মে প্রীতি জানিয়েছেন, তাদের স্ব-ধর্মে নিধনং শ্রেয়, বলে উপদেশের চড় উচিয়ে আসেন না, পুণর্মূষিক হতে সাহায্য করেন— তাদের মাথায় ঘোল ঢেলে হিন্দু না করতে পারলে এঁদের শান্তি নেই। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রোগ্রাম, যে সমস্ত নারী অসহায়, যারা ভাগ্যদোষে দুর্বৃত্তের হাতে পড়েছিল বলে সমাজ সংসার তাদের

ঘরে স্থান দিল না, এঁরা তাঁদের সসম্মানে আশ্রয় দেন। সমাজ যে মানুষের মংগলের জন্যে, একথা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তবে শুধু আশ্রয় দিয়ে সমাজের ঘাড়ে একটা পরগাছা গজাবার সাহায্যকারী হতে চান না, শিক্ষা দিয়ে, শিল্প কর্ম শিখিয়ে, শক্ত পায়ের ওপর দাঁড়াবার ইমিউন পুরে দেন।

* * *

হর্ষবর্ধনকে ঘায়েল করার সন্ধানে অপরাহ্নে কাঁচা ঘুম ভেঙেই যাত্রা করতে হল। পথে জানলাম, তাঁব রাজধানী কোথায় ছিল সেইটেই প্রমাণ সাপেক্ষ? অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, এমন ক্ষেত্রে ধ্বংসস্তূপ ভরসা করে অনুমান করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাময়িকভাবে আবার বুদ্ধিভ্রষ্ট হতে হল, তার মাঝে সদম্ভে বিরাজ করছে এক বিরাট মসজিদ। পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে জানলাম, নবাব আওবংগজেব তাঁব গুরুদেব শেখ আলীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে এখানে মুসলিম প্রাধান্য বিস্তার করেন। আওরংগজেবের অচলা গুরুভক্তি—বিড়ালকে তপস্বীর বেশে দেখলেও যে বিশ্বাস হয় না!

এদিকে ধ্বংসস্তূপের ইটপাটকেল নিয়ে বন্ধু খুব ব্যতিব্যস্ত। শেষে এক মুখ্য কারণে মুখর হয়ে ওঠে, উত্তেজিতভাবে বলে—প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ দিয়ে কিনা রেলপথের পাথরের কাজ মিটিয়েছে! এ নাকি পরাধীন দেশের অশেষ দুর্ভাগ্যের অন্যতম!

এসব কথা শুনে সত্যি আমার ভয় ধরেছিল, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে না শেষে সাপ বের করে—স্বাধীন, পরাধীন, বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, এমনি ধারা এগিয়ে গেলে হয়েছে আর কি?

সত্যি বলতে কি, দুপুরের ঘুমের আমেজ তখনও আমার কাটেনি; ভাবছিলাম, এক পাত্র গরম পানীয় পেলে মন্দ হয় না। টি একসপ্যানশন

বোর্ডের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধেও মনে গভীর সন্দেহ জেগেছিল—এমন একটা সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা এখনও আনএক্‌সপ্লোরড রয়ে গেল ?

বন্ধুর উদাত্ত আহ্বান চিন্তাস্রোতকে ব্যাহত করে। সে বলে—এগুলো হল দেশের অমূল্য সম্পদ, এই উপকরণ দিয়ে প্রমাণিত হবে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি—গড়ে উঠবে দেশের ইতিহাস। স্বাধীন ভারতে এ যে হবে দেশ-মাতৃকার আভরণ।

বলি—ভয় নেই, তখন এই ইষ্টকস্তূপ রক্ষাকল্পে কমিশন বসান হবে; ভোজের ব্যবস্থাও থাকবে এবং সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে পরিকল্পনা পেশ করে। মামা-মাসিকে ধরে খিড়কীদ্বার দিয়ে যদি উপদেষ্টা কমিটিতে একটা আসন অধিকার করতে পারি, প্রস্তাব তুলব এক অমর স্মৃতিসৌধ স্থাপন করার। সে প্রতিষ্ঠান অন্নপূর্ণা পাইস হোটেল হবে না, অগণিত হরিজনের একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করবে না, বরং সে হতে পারে 'রাজকুমারী' 'কাফে-ডি-কুরিয়া', 'চাং-ওয়াং'—ড্যান্স ও ক্যাবারে না হোক, নির্বিবাদে আ-লা-কারতা সমাপন করা যাবে। নিতান্ত পক্ষে চা-চা বলে প্রাণটাত টা-টা করবে না। হয়ত সে প্রতিষ্ঠানে টেবল ফাটিয়ে আমরাও গেয়ে উঠতে পারি, চায়ের পিয়ালে তুফান তোল, দে দোল দোল।

নাঃ, পরিষদ গড়া আর হল না। বন্ধুবরের ইতিহাসের খোঁচায় এমন গঠনমূলক কাজটা পরিকল্পনাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সুলতান মামুদ না হয়, সতেরোবার ভারত অভিযান করেন, তাতে হয়েছে কি ? থানেশ্বরের কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরে লোকের বোকামি ভাঙিয়ে বহু ধন-রত্ন সংগ্রহ করেছিলেন; তিনি তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে সে অনর্থের বোঝা মাথায় করে নিয়ে গেলেন। বন্ধুর বক্তব্যের বোধহয় শেষ নেই, বলে—সে নাকি দশ বিশ নয়, হাজার হাজার মণ স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরৎ—ক্রেট দিতে দিতেই সুলতান সাহেব প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার জোগাড়। তবে ইনকন্‌সিডারেট এ অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারবে না—বার বার যেমন

ধন সম্পদ নিয়ে গেছেন, ওদের অসুবিধা হতে পাবে বুঝে, তরবারি ও শক্তির অপব্যয় সত্ত্বেও লোক সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে গেছেন।

আবাব এখানেই হর্ষবর্ধন দানছত্তর খুলে দিতেন, পাঁচ বছর অন্তর, আড়াই মাস ধবে চলত দান-উৎসব। আমীর যেখানে ফকীর হত, সে গুরুত্ব অস্বীকার করলে আজ লালঝাণ্ডাওয়ালারাও হয়ত তেড়ে আসবে ?

তাঁরা উভযেই মৃত্যুতে মহীয়ান হয়ে আছেন। সুলতান মামুদ এক ফোঁটা জলের অভাবে মরুভূমিতে প্রাণ হাবিয়েছিলেন আর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ-প্রীতির জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রাম্হণ আততায়ীর হাতে।

*   *   *

ধর্মক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্রে সমবেত হলাম, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র কোথায় ? কর্ণল থেকে আম্বালা এই বিস্তৃত ভূখণ্ড নাকি ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। সেই মান্ধাতা আমলেও যদি এত বড এলাকায় যুদ্ধ ঘটে থাকে, তাহলে তাকে পাবলিসিটি দিয়ে ব্যাসদেব কিছুমাত্র অসংগত কাজ করেন নি।

অর্জুন মুমূর্ষু ভীষ্মেব শেষ আকাংখা মেটাতে নিরপরাধ মেদিনীকে শরবিদ্ধ করে গংগা আনয়ন করেছিলেন, অবাধ্য ছেলেকে কান ধরে হিড হিড করে টেনে আনার মত করে—তাতে কার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল বলতে পারি না। তবে সেই জলাধাব অবলম্বন করে আজও বেঁচে আছে এক জরা-বার্ধক্য-প্রপীড়িত কূপ, সেটা দর্শন করে পুণ্যসঞ্চয়ের বোঝা ভারী করা যায়।

গীতা-ভবনের সামনে আর একটা দর্শনীয় বস্তু আছে, তাব উল্লেখ না করা অন্যায় হয়ে গেছে। সেটা হল বিরাট দীঘি—দৈর্ঘ্য-সম্পদ থেকে যদি দীঘি নামের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে কারো আপত্তি করার কিছু থাকে না। আরও শুনলাম, এ নাকি প্রবীনত্বে অনেকের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ গোছের। শুধু কি তাই, পরশুরাম এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন এখানে। তিনি এক-বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তাতেও সন্তুষ্ট

হলেন না; তাদের আত্মা তাঁর প্রাণে রোষের সঞ্চার করতে লাগল। শেষে এই জলাধারের পাড়ে বসে শেষ অস্ত্র হানলেন, তাদের আত্মা-বিনাশের মানসে করলেন তর্পণ।

ভাবছিলাম, যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ ক্ষাত্রধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ক্ষাত্রধর্ম ধ্বংস করার অভিযোগে বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, গান্ধীজী সবাইকে কড়া আইনের প্যাঁচে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুল বড় আত্মবিশ্বাসী, ওসব কথায় আমলই দেয় না। বলে, রেখে দাও তোমার আইনের কচকচানি, মন্ত্রের ঘ্যানঘ্যানানি; দশবার আচমন করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করলেও, আমার অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সব তাল কেটে যাবে!

ক্ষাত্রধর্মের বিনাশ হয় স্বপ্ন, নয় মায়া, না হয় মতিভ্রম! পরশুরামের প্রত্যাশায় আজ বৃথা উন্মুখ হবার প্রয়োজন নেই; বিংশ শতাব্দীতে তাদের আসন একেবারে পাকা করে নিয়েছে। আজকের ক্ষত্রিয়কুল আরও বিস্তৃত —আজ তারা শুধু অসিজীবি নয়, মসিজীবীও বটে। কলকাতায় সকাল-বিকেল ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে চলে এক জনসমাজ—তাদের কেউ বা স্যুটেড-বুটেড, মাথায় টুপি, গলায় গলবন্ধ—জাতিতে তাঁরা ভারতীয় কিন্তু অফিসের পদবী মাফিক, হয় বড় সাহেব, না হয় ছোট সাহেব। আর এক-দল, মাজাভাঙা, চোখে দীপ্তি নেই, সাহেব বলতে অজ্ঞান—তারা হল মাছি-মারা কেরাণীর দল। জাত বিচারে এরা না ব্রাম্হণ, না বৈশ্য—সনাতন ক্ষত্রিয়কুল। এ রক্তবীজের ঝাড়—শতাব্দীর আশীর্বাদ—এরা চিরঞ্জীব!

আম্বালা

অবিরাম ঝড়-জল আমাদের খোঁড়া করে রেখেছিল। মাঝে সামান্য ইণ্টারভাল পেয়েই দিক-বিদিক্ চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা দ্বিপ্রহরে যখন আম্বালায় ঠেলে উঠলাম, দেখি বর্ষার চিহ্নমাত্র নেই, বরং

চলেছে সূর্যের প্রচণ্ড বিক্রম। যথাস্থানে এসেছি কিনা সন্ধান নিতেই লোকে জানায়, এ হচ্ছে কান্‌ট, সিটি কয়েক মাইল দূরে।

—এইত বেশ সহর, আবার খোঁজাখুঁজি করে দুপুর রোদে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ?

আসলে আম্বালা নামে দুটি সহর আছে। একটির নাম আম্বালা ক্যান্‌টনমেন্ট, অপরটির নাম আম্বালা সিটি। ক্যান্‌টনমেন্টের রাষ্ট্রভাষা হল ছাউনি, বাংলা ভাষায় যাকে বলে সৈন্যশিবির। তবে সৈন্যদের আশ্রয় করে বেশ বড় সহর গড়ে উঠেছে। সহরত্ব যদি স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সহর হিসেবে কান্টের দাবীই অগ্রগণ্য। তুলনামূলক বিচারে সিটির ওপর পিটি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

এক বাঙালী ডাক্তার থাকেন এই সেপাইমার্কা সহরে। তাঁর উদারতারও বেশ নাম-ডাক আছে। সঞ্জীবচন্দ্র বলে গেছেন, প্রবাসী বাঙালী মাত্রেই সজ্জন, এ কি ভুল হবার ? ডাক্তারবাবুর উদারতা ভাঙিয়ে এ বেলাটা মন্দ কাটবে না। বাড়ী খুঁজে নিতে মোটেই বেগ পেতে হল না, বাড়ী নয় ত প্রাসাদ। 'প্রভাতে উঠিয়া কি মুখ দেখিনু' তা ঠিক স্মরণ নেই, তবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। এমন শুভদিনে পরম শত্রুকেও লোকে আলিংগন করতে পারে।

বড় লোকের বড় অন্তঃকরণ, তাই সসম্মানে গলি-ঘুঁজির মত ওঁচা জিনিষ দেখিয়ে তৃপ্তি পেলেন না, দেখিয়ে দিলেন রাজপথ। 'বাবু বললেন, বাবু বাড়ী নেই' ধরণের কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না ; 'কানে দিয়েছি তুলো পিঠে বেঁধেছি কুলো' এই পদ্ধতি শরণ করে সেই বার্তাবাহক মারফৎ আবার আর্জি পেশ করলাম, বলে দিলাম, ফর রিকনসিডারেশন। বেঘরেদের বেহায়াপনা দেখে স্বজাতির অধঃপতনে নিজে লজ্জা বোধ করেছিলেন, তাই বলে পাঠালেন সন্ধ্যের দিকে এসে দেখা করতে

বাঙালী ভেতো হলেও অনুষ্ঠানে মা কালীর উপাসক। প্রবাসে অভাজন বাঙালীর পক্ষে কালীবাড়ী এক পরম সম্পদ, আশ্রয় মিলে গেল সেখানে।

পাতিয়ালা

আম্বালার মায়া ত্যাগ করে যখন বেরিয়ে পড়লাম, সূর্যদেব আকাশের একপাশে ঢলে পড়েছেন। বাজপুর নামে এক ছোট্ট সহরে আসতেই তিনি দিগন্তের প্রান্ত থেকে আমাদের বিদায় দিলেন। জলযোগের গোলযোগ সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম পাতিয়ালার পথে, দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল; জি টি রোড ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরতে হয়।

ভৌগলিক সীমারেখায় পান্জাবের আকৃতি যাই থাক, দেশবাসীর আকৃতিগত তারতম্য দিয়ে বিচার করলে এখান থেকে তার শুরু বলা যায়। আকারে, স্বাস্থ্যে এবং শারীরিক গঠনে, এত দিন যাদের দেখেছি, তাদের পান্জাবী বলতে মন খুঁৎ খুঁৎ করে, আড়ে এবং বাড়ে তারা খুব তাগড়াই, এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। এই এলাকার অধিবাসীদের ক্ষীণ, খর্ব এসব বিশেষণ দিলে প্রতিবাদ জানাতে কৃপাণের প্রয়োজন হবে না, পান্জা দেখিয়ে আমাদের ত্রাহি মধুসূদন বলিয়ে ছাড়বে।

পাতিয়ালা পৌঁছুতে আর মাইল দশেক আছে, অন্ধকারটাও বেশ জমাট বেঁধে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করে রাধা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, আমরা নিয়তির হাতে জীবন সমর্পণ করে গৌরবান্বিত হলাম। ভগবান যা করেন মংগলের জন্য, তা বলা ছাড়া উপায়ই বা কি? মংগলময় ভগবান কি মধ্যপথে দেখা দিলেন? গহন অরণ্যে ধ্রুবের সামনে যেমন আবির্ভূত হয়েছিলেন পরম কারুণিক, মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডবের সাথে যেমন গিয়েছিলেন সারমেয়রূপী ধর্ম? তাঁরা ত এমনিতেই সর্বশক্তিমান,

কিন্তু এরা যে অস্ত্রবলে বলীয়ান? শ্রীভগবান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন, এ কি সেই দশাবতারের অন্যতম? মন পাপে ভরা, তাই কেমন যেন শংকা জাগে—এমন দু-জন সুপারম্যান এই নোম্যানস ল্যাণ্ডে শেষে কি করতে কি করে বসে? পর মুহূর্তে মনকে আশ্বাস দেই, আমাদের আবার ভয় কি?—গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত। বাঁচবার জন্যে স্থূল ঢাল-তলোয়ারের সাহায্য নিতে হলে সে বড় লজ্জার কথা। স্যামসনের শক্তি ছিল তার চুলে, আমাদের ব্রম্হাস্ত্র ছিল বাক্যবাণে—বাক্‌যুদ্ধে বাজি মাৎ করার পদ্ধতি আমাদের আয়ত্বে। দুর্দৈব আর কাকে বলে, এমন সময় মনে পড়ে গেল গান্ধীজী বাক্‌সংযমী হবার উপদেশ দিয়েছেন। কো-ইন্‌সিডেন্স অফ ইন্‌সিডেণ্টস্‌, সেই মুহূর্তে তারা পিলে চমকানো হাঁক ছাড়ল, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আতংকিত হয়ে উঠল, জিহ্বা-ত্বক গান্ধীজীর বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিল।

অবশ্য ইষ্টনাম জপ করার মত অবসরও মেলে না, ব্যাগ দুটো ছিনিয়ে নেয়, সাইকেল দুটো খোলাম-কুচির মত ছুড়ে ফেলে। এবার অমৃতবর্ষী বাণী আসে—জলদি নিকালো, বের কর কি আছে?

অনর্থকরী অর্থ বা সম্পদ কিছু থাকলে বিনিময়ে রেহাই পাবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বর্তমানে দেবতুষ্টির মত কোন সামগ্রী ত এই অভাজনদের কাছে নেই। ক্ষীণস্বরে কি যেন একটা উত্তর দিয়েছিলাম, ঠিক স্মরণ নেই; তবে সেন্সারি নার্ভগুলোর এখনও স্মরণ আছে সড়কির ভোঁতা প্রান্তের গুঁতো। তারপরই মধুবর্ষণ—তুম বদমস, ডাকু, নিকালো আভি?

ভাবছিলাম, বদমায়েস-চোর-ডাকাত যদি গালাগাল হয়, সে ত ওদের গায়ে লাগবে? শুনেছিলাম, বীর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের নাম ধরে হুংকার দিতেন, এ বোধ হয় তারই নমুনা?

আমাদের আর পরিশ্রম করতে হল না, অনুগ্রহ করে তাঁরাই ব্যাগ খুলে সব ছড়িয়ে ফেললেন রাজপথে, কিন্তু নেবার মত কিছু নেই, বের

করবে কোত্থেকে ? তাদের প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা, এত পরিশ্রম, সব বৃথা গেল ; এবার নিশ্চয় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে, আমাদেরও হয়ত টেনে ছিঁড়ে খাবে ?

একি ? পুরুষসিংহও হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠলেন, দস্যু রত্নাকর বাল্মীকিত্ব প্রাপ্ত হলেন—সাহারা মরুভূমির বুক চিরে দেখা দিল, তনুভরা যৌবন তাপসী অপর্ণা ঝর্ণা—ঘেঁটু ফুলের বন থেকে ভেসে এল গুলবাগিচার সুবাস। মূর্তিমান বিনয়—হেঁ-হেঁ কিছু মনে করবেন না, অপরাধ হয়ে গেছে ; আমরা ষ্টেটের কর্মচারী, একটা বড় চুরি হয়ে গেছে, তাই অনুসন্ধানে বেরিয়েছি।

—তা আমাদের গায়ে চোর ডাকাতের গন্ধ ছাড়ে বুঝি ?

—সত্যি আমরা অনুতপ্ত, আমাদের জীবিকাই হল ঘৃণ্য কাজ, এসব কথা ভাবতেও লজ্জা হয়, কিন্তু উপায় কি ?

—না-না, এতে কিন্তু হবার কি আছে ? লজ্জা প্রকাশ করার গুণেও আপনারা অশেষ গুণান্বিত। ভয় হয়, শেষে না লজ্জাই আপনাদের অংগের ভূষণ হয়ে পড়ে। তবে দেশের ও দশের সেবার জন্যে যদি অন্যায় অত্যাচার করতে হয়, সামান্য দুর্বিনীত হতে হয়, তাতে লজ্জার কি আছে ?

এগোতে এগোতে বন্ধু ডিকেন্সের কথা কোট্ করে—ফার বেটার হ্যাংগ রঙ্ ফেলো দ্যান নো ফেলো।

আমি বার্ণার্ড শ-র কথা জুড়ে দেই—দি রঙ্ ফেলো ইস দি রাইট ফেলো টু হ্যাংগ।

বারাব্বাসের বদলে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তাই ত তাঁর মহিমা প্রচারের এত সুবিধে হল।

* * *

পাতিয়ালা দেশীয় রাজ্য—বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের অন্যতম। অবশ্য 'পেপসু'র মাতব্বর হবার সুযোগ তখনও আসেনি। বিরাট সিংহদ্বারের

ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলাম রাজধানীতে। পান্‌জাবীরা লোক ভাল, কেউ আশ্রয়ের সন্ধান করছে শুনলে সংগে করে ধর্মশালায় পৌঁছে দেয়—ধর্মপ্রাণ বলেই কামনা করে, অপরের ধর্মে মতি হোক।

প্রকাণ্ড ধর্মশালা, বাড়ীতে নতুনত্বের ছাপ, তার কলেবর আরও বর্ধিত করা হচ্ছে। ভাল ঘর-দোর দেখে আশ্বস্ত হলাম, এবার থাকবার দরবার পেশ করা গেল।

হাইলি ইলাষ্টিক বল দেওয়ালে ছুড়ে মারলে যেমন হয়, তেমনি বিদ্যুৎ-গতিতে উত্তর এল—জায়গা নেই!

এরাও কি চোর ডাকাত এমন কিছু ঠাওর করল নাকি? হয়ত তাই হবে। দ্বিতীয় দফায় দীপক রাগিনীতে উত্তর আসে—কানে কালা, শুনতে পাও না? বলছি জায়গা নেই।......বেরিয়ে যাও এখান থেকে?

কিন্তু আমাদের তরফ থেকে সে আদেশ শিরোধার্য করার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না—বারান্দায় এক খাটিয়া ছিল, চেপে বসলাম। খাটিয়ার লোকটি সন্ত্রস্ত হয়ে সরে বসে। এবার শক্তিধরের আভিজাত্য নিয়ে দাবী জানালাম—জায়গা আমাদের দিতেই হবে এবং জায়গা নেই এমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলার কৈফিয়ৎ-ও পেশ করতে হবে?

তার চড়া স্বর খাদে নেমে আসে। ওষুধ ধরেছে বুঝে আমরা আর এক মাত্রা চড়িয়ে দেই।......শেষে বলে—ওহো আপনারা......বসুন বসুন। মাপ করবেন, আমি ভেবেছিলাম, আপনারা মুসলমান।

অপরাধ হয়েছে বলে অভিযোগ থাকলে তবে ত মাপ করার প্রশ্ন? কিছুক্ষণ আগে লজ্জাময়ের যে চাবুক খেয়ে এসেছি, এই সামান্য কারণে মনে দাগ কাটে না। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ি এই ভেবে, তেমন কোন অশাস্ত্রীয় লক্ষণ অংগের কোথাও প্রকাশ পেল কি? পৈত্রিক সম্পত্তি ব্রাহ্মণ্যের নিদর্শন, পৈতেগাছটা দেখিয়ে দিলাম। বুঝিয়ে ছাড়লাম, আমি শুধু হিন্দু নয়, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাম্হণ।

আপনারা ভাববেন না, অগ্য রজনীতে নাটকের এইখানেই যবনিকা পাত। তৃতীয় অংকের জন্যে তৈরী থাকুন। আহারাদি সেরে নিদ্রাদেবীর নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম। ছুটো ফাঁড়া যখন কেটেছে, এবার দীর্ঘ পরমায়ু—আজকের মত পরম শান্তি।

স্বপ্নজড়িত নয়নে কেমন যেন অনুভব করি মধুর ধ্বনি, ক্রমে তা আরও স্পষ্ট হয়, তাই ত আমাদের দ্বারে বাজে নূপুর-নিক্কণ। তাহলে, সজল নয়ন করি প্রিয়া পথ হেরি হেরি,······এল কি লাবণ্যপুঞ্জে, অনবগুণ্ঠিতা, অকুণ্ঠিতা—দ্যুলোকবাসিনী উর্বশী ? তার অংগে আঁচল সুনীল বরণ, ঝুণু ঝুণু রবে বাজে আভরণ—একি স্বপ্ন, না স্বর্গ!

কিন্তু এ যে দেখি ভ্রূকুটি কুটিল, এ যে গরজন—এর বজ্র নিনাদে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা! ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দ্বার খুলে দেই। এতক্ষণে বেশ উপলব্ধি করি, মোদের নিশার স্বপন শেষ হয়েছে, তার বরণডালায় ফুল নেই, কেবল ভুল দিয়ে আমাদের ভোগাতে চায়।

নবাগত মহাপ্রভু হচ্ছেন মহারাজাধিরাজের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। সন্ধান পেয়েছিল, সুদূর বাংলাদেশ থেকে দু-জন সন্দেহজনক লোক এসেছে—বুঝি বা তাদের এতই ব্রম্হ-তেজ দেশটা মন্ত্র বলে না ওলট-পালট করে দেয়। তাই চলেছে এই অভ্যর্থনার মহোৎসব। নাম, ধাম, কোষ্ঠী, ঠিকুজী বেশ সযতনে রক্ষা করলেন। আমাদের উর্ধতন কয়েক পুরুষকেও শ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কেবল নথিপত্রে বিধিবদ্ধ করে নিষ্কৃতি দিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে এল চিরাচরিত বৈষ্ণব বিনয়—অপরাধ নেবেন না, চাকরী রক্ষা করতে মনুষ্যত্ব হারাতে হয়েছে, ক্ষমা করবেন কি ?

ক্ষমাধর্মে আমাদের সুমতি না থাকলেও তাদের সবিনয় ব্যবহারের কোন ব্যতিক্রম হবে না। তবু বলি—সীতা দুবার অগ্নি পরীক্ষা দেবার ভয়ে মা বসুন্ধরার অংকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা পুরুষ, অত তাড়াতাড়ি

ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কোন সংগত কারণ নেই, তবু আল্‌ফা, বিটা, এক্‌স, ওয়াই, যা হোক একটা সংখ্যা যদি অনুগ্রহ করে বলে যান, তার জন্যে তৈরী থাকতে পারি।

* * *

রাজপ্রাসাদের নাম মতিবাগ। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন না হলে বুঝতে হবে, রাজপ্রাসাদ হীরা-জহরৎ-এ পূর্ণ। হীরা-জহরৎ-এর সঠিক সংবাদ দিতে পারব না, তবে চুপি চুপি একটা কথা জানাতে পারি, যদি গোপনতা রক্ষার আশ্বাস দেন? দেখবেন, কেউ যেন রিকুইজিশন করে বসবেন না, রাজপ্রাসাদ এখন খালি পড়ে আছে—মালিক সিমলার শৈল-নিবাসে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘুর্ণিপাকে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিল্লী-সিমলা বার্ষিক গতি অকস্মাৎ বানচাল হয়ে গেল, কিন্তু মহারাজ পোড়া দেশের অকালবোধন মানতে রাজি নন। তাই এপ্রিল মাস পড়তেই সকলকে ফুল করে দিয়ে তিনি সপারিষদ যান সিমলা। সেই অবসরে সংস্কাব চলে রাজ-প্রাসাদের। আর যত অপরাধ যেন *এই* অভাগাদের, তখন পর্যটকরা প্রাসাদে ট্রেসপাসার্স। কলসীর কানা মারলে তাকে প্রেম নিবেদন করাই ভারতীয় রীতি; তাই জানাই, প্রাসাদের বিউটি কনটেস্ট হলে তাকে মিস প্যালেস করার সুপারিশ রইল।

প্রাসাদ পেরিয়েই পেলাম ঝিল। এবার সত্যি মন-নির্ঝরের স্বপ্নভংগ হল—এ যে সুসজ্জিত নগরীর রম্য-মূরতি, ফ্যাসানে কেতাদুরস্ত। ঝিলটা আঁকা-বাঁকা গতি পথে এগিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে গড়ে উঠেছে যেন প্রবাল-দ্বীপ, তার কিনারায় ছোট ছোট বোট বাঁধা; দু-কূলে বিছান মরশুমি ফুল, চারিদিকে রঙ্‌-বেরঙের আলোর বাহার, তারা রাতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

দুঃখ এই, একটা ব্ল্যাকস্পট থেকে গেল চিরতরে, বিদেশে বসে বোকা বনতে হল। ব্যাপারটা বলি, প্রাসাদের কাছেই ছিল এক বাংলো

প্যাটার্ণের বাড়ী ; এ নিশ্চয় কোন হোমরা-চোমরা রাজপুরুষের হবে। সেই ভাগ্যবান পুরুষপ্রবরটি কে, জানতে গিয়ে এক বিরাশিসিক্কা চড় খেলাম। বলে, সাত সকালে সে মহাপুরুষের নাম করি কি করে, হাড়ি ফাটবে যে ? তিনি হলেন নিত্যকর্মে নরসুন্দরের ভাই, মহারাজের রজক মহাপ্রভু।

মতিবাগ সুমতি জানালেন না, তাই বেড়ে উঠল দেখার দুর্মতি। ভাগ্যক্রমে পরিচয় হল এখানকার কনট্রাক্টর এক আসামী পান্‌জাবীর সংগে। বাঙালীর গড়পড়তা উচ্চতা পাঁচ ফিট, যুক্ত প্রদেশে সাড়ে পাঁচ, সীমান্তের নিম্নতম হল ছয়, তাহলে আসামে নিশ্চয় সাড়ে চার ফিট হবে ; সেই ধর্মে তিনি আসামী। তাই হয়ত আমাদের বেয়াদপিতে না চটে পটে গেলেন। তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় প্রাসাদ পিঞ্জরে একটা ছোট্ট দৃষ্টি হানতে পেরেছিলাম।

ইন্দ্রপুরীর দর্শনীয় বস্তুর ফিরিস্তি দিলে সে এক মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। আরও বিপদ, প্রথম ঘরে পা বাড়াতেই আমাদের দেবচক্ষু হবার উপক্রম, আগলমুক্ত পশুরাজ হল গেটের সাস্ত্রী, ভেতরে বিভিন্ন আকারের এবং প্রকারের পশু। চিন্তিত হয়ে পড়ি, কার প্রভাবে ব্যাঘ্রে-বৃষভে এমন প্রীতি, তারা পরস্পর ভাই ভাই ! এর মূলে কি গান্ধীজীর অহিংসনীতির প্রভাব ! কিন্তু মানুষকে তেমন সুনজরে নাও দেখতে পারে, মানুষ যে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছে ; এ কথা মনে হতেই চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় ! তখন সংগী হেসে বলে, ভয় পাবেন না, একটু নজর দিয়ে দেখুন, ওদের নয়নতারা প্রাণহারা। এ যাদুঘর রাজবংশের শিকার চাতুর্যের গৌরব বর্ধন করে বিরাজ করছে।

এবার চলে আসুন স্পোর্টস কর্ণারে। এখানে ব্র্যাডম্যানের ব্যাটের সন্ধান পাওয়া যাবে, ডেনিস কম্পটন কোন বলে প্রতিপক্ষের হৃদয় কম্পন সৃষ্টি করতেন তা পাবেন, সেই আদিম যুগের অলিম্পিক খেলায় পুরস্কার

স্বরূপ যে মালা দেওয়া হত তাও পাবেন, এমন কি স্বয়ং হারকিউলিয়াসকে হাতের মধ্যে পেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু অলিম্পিক টর্চটা থাকলে এথলেট ওয়ার্লডের সেরা মিউসিয়াম হত।

বড় বড় অয়েল-পেন্টিং আছে। তার কিছু পারিবারিক চিত্র, কিছু শুধু অকারণ পুলকে রাখা, আর্ট ফর আর্ট'স সেক কথাকে সার্থক করতে। তবে আভিজাত্যের অভিমান এসথেটিক ইম্পালসকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হল না। শেষে মনের গাত রুদ্ধ করল প্রায় দু-তিন মানুষ লম্বা এক গজদন্ত, তাতে ঝাড লণ্ঠন ঝোলান, মাঝে ঘড়ি নামধেয় এক ত্রিমূর্তি—সামনে আছে টাইম ফ্যাকটব, একপাশে ব্যারোমিটার, অপর পাশে থারমোমিটার।

বন্ধু বলে—সময়ের মান, তাপমান ও চাপমান অর্থাৎ সব মিলিয়ে আত্মাভিমান?

—তা হতেও পারে।

নাভা

পাতিয়ালা রাজ্যের গায়েই নাভা—ভীম ভবানীর পাশে তালপাতার সেপাই, স্যামসনের পাশে নারসিসাস, তবে তাকে উল্লেখ না করে টপকে আসা সম্ভব নয়; দেশীয় রাজ্যের দরবারে তারও সুপ্রতিষ্ঠিত আসন আছে। আজও লোকের ধর্ম-কর্মে মতি আছে দেখে সত্যি আশ্চয লাগল। যুদ্ধোত্তর যুগে লোকে এমন ধর্মশালা গড়বে, ভাবতেও কষ্ট হয়। এ দুঃখ দহন করার জন্যে মনকে সন্দেহ-সংকুল করতে হয়, ধনকুবেরের এই খয়রাতি কি পাপ-সমুদ্র পার হবার খেয়া তরী, রাবণের নোনা সাগরকে ক্ষীর-সমুদ্র গড়ার সাধ?

ভদ্রলোক রামভক্ত কি নিজের নাম ভক্ত, সে পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি, রামজীর ধর্মশালা এই নামটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। আরও

সৌভাগ্য, আলে'চ্য রামজী আপ-টু-ডেট না হলেও রুচিমার্জিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয় দফায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম মাথার ওপর বিজলী চালিত পাখা দেখে। সবার বড় মজা হল, এত সুখ-সুবিধা সত্বেও খাটিয়ার জন্যে চারটে পয়সা না দিলে চলে না—রামজীর অগাধ অনুগ্রহের পাশে এই সামান্যতম সংকীর্ণতা দৃষ্টিকটু লাগে। ব্রাম্হণ্য ধর্মকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা জানালে◌ চাণক্যের উন্‌ছো বৃত্তিকে মোটেই সমর্থন করা চলে না।

শয়নের সুব্যবস্থা হল, এখনকার মত অন্যতম নিত্যকর্ম হল, ভোজনপর্ব সমাধা করা। ইষ্টমন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। এখানকার ইষ্টমন্দিরেব বৈশিষ্ট্য আছে। 'নীরোর প্রেয়সী' বা' রাজকুমারীর' অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয় না, মুচিপাড়াব মোড়ে বা কাঁসারী পাড়ার কোণে যে সব চা-চক্র আছে, সেখানেও বিরাজ করছে ঘোমটাঘর। কলকাতার ঘোমটাঘর ঘোমটাধাবীদের জন্যে, পান্‌জাবে ঘোমটার বহর ঘনঘটা করে আসেনি, তাই বোধহয় ঘোমটাঘর-প্রীতি তাদের বেশী। প্রতি রেষ্টুরেণ্ট আর হোটেলে আছে এই সব ওপন প্রাইভেট চেম্বার—আপনার হয়ত পান্‌চ করার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সেখানে এমন বহু এক্‌সপার্টের সন্ধান পাবেন, যারা বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত না করে ঢক ঢক করে শুখনো গলায় ঢেলে দিতে পারে। তাদের ভোজন দর্শনে বলে, আদিপর্বে সঞ্জীবনীসুধা পান না করলে ভোজনই বৃথা।

মনের জড়তা ভেঙে ঘোমটাঘরে অনুপ্রবেশ করার মত তখনও শক্তি সঞ্চয় করতে পারিনি। বাইরে বসেই সে মধুময় আবেশ উপভোগ করতাম। আরও মজার কথা, সেদিন কক্‌টেলের এক মনগড়া ফর্মুলা বলে একজনের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলাম। এবার গভীর বন্ধুত্ব করার জন্যে পেড়াপীড়ি। ওদের আবার বিশ্বাস আছে, বন্ধুত্ব অন্তরংগ করতে হলে তা সুধাসিক্তিত করা প্রয়োজন। বুঝি বা ওটাকে ওরা অগ্নিসাক্ষীর সমতুল্য ধরে। বাধ্য

হয়ে বলতে হয়, দেখ শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠায় নয়, সামগ্রীতেও এরা নিম্ন মধ্যবিত্ত। এতে আমরা অভ্যস্ত নই। আদর্শ জিনিষ, যেমন 'সীতাপতি', 'লাল সাদা' বা কোন ফরাসী সুন্দরী হলে, সানন্দে গ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু এখানে অনুরোধ জানালে মার্জনা করবেন।

* * *

নাভার সিলভার জুবিলি পার্ক জানি না কার জুবিলি উপলক্ষে নির্মিত, তবে সেখানে পঞ্চম জর্জের বিরাট এক প্রস্তরমূর্তি আছে! সেখানে আরও একটি প্রস্তরমূর্তি আছে, সেটি হীরা সিং-এর, তিনি বর্তমান মহারাজের পিতামহ। উদ্যানটি সযত্নরক্ষিত। সন্ধ্যায় যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের আনন্দ দেবার জন্যে সপ্তাহে তিন দিন সরকারী ব্যাণ্ডপার্টি আসর জঁাকিয়ে রাখে, অন্যান্য দিন রেডিও চলে।

আর একটি দর্শনীয় বস্তু, মহারাজের অতিথিশালা, যাকে গেষ্ট হাউস বললে স্বরূপ প্রকাশে বেশী সহায়তা করা হবে। এ বিশাল শালা রাজপ্রাসাদ থেকেও সুসজ্জিত। অতিথি নারায়ণ, এমন আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে এই বিধি-ব্যবস্থা। তবে দেখবেন, ইণ্টারপ্রিটেশনের দোষে বিপরীত অর্থে গ্রহণ করবেন না। এখানে অতিথি হবার সৌভাগ্য যাদের হয়, তারা দরিদ্র-নারায়ণ নয়, নর-নারায়ণ—হয় হিস হাইনেস মহারাজাধিরাজের ঝঁাঝ আছে, না হয় হিস এক্সেলেন্সির এসেন্স।

* * *

বহুলোক আছে যারা এড্‌ভেঞ্চার-বিলাসী, শিকার করতে যাওয়া যাদের সখ—বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ান একটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। তেমন ধাতু দিয়ে গড়া হলে, মনে হত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আমার কাছে তা পরম ভীতিপ্রদ, আজও সে কথা স্মরণ হলে সংকুচিত হয়ে পড়ি।

নাভা ষ্টেটে আছে এক বিরাট চত্বর দিয়ে ঘেরা গুরুদ্বয়ারা, মাঝে

দীঘি। দীঘির পাড দিয়ে চলেছি, পথের কাছে গাছের সংগে শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল এক বাঘা কুকুব। কিন্তু কেমন শান্ত-সুবোধ ছেলের মত চুপটি কবে বসে আছে। সে যে ভিজে বেড়াল, কি কবে জানব? তাকে আমল না দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম, বোধহয় আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তার সীমানাব মধ্যে পা দেওয়া মাত্র আমাকে লক্ষ্য কবে ভীম গর্জনে লাফ দিল। আর কযেক ইঞ্চি কাছ দিয়ে গেলে, সে যাত্রা অন্তিম যাত্রা হত। বস্ত্র আর এক থাবা মাংসের বিনিময়ে কোন বকমে জীবন বক্ষা পেয়েছিল।

জীবনটা না হয বক্ষা পেল, কিন্তু এখন যাই কোথায? চকচকে সাইনবোর্ড আঁটা, নামেব পাশে এক গোছা অ্যালফাবেট বসান অস্ত্রবিদেব কাছে গেলাম, দর্শনী মকুবেব আশ্বাস পেযে দবশনও লাভ করলাম কিন্তু ওষুধের যা ফিরিস্তি দিলেন, অর্থব্যযেব যে আড়ম্বরে অনুবোধ জানালেন, তাব চেয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা সহজ, ধর্মযুদ্ধে স্যাটানকে বিজয়ী বলে ঘোষণা কবা যায, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হওযাও আশাসম্পনক।

সহব মন্থন করে শেষে এক হকিমীব শরণ নিলাম। বিচিত্র পোষাকে চিত্রিত হযে, অদ্ভুত বর্ণবিন্যাসে বুদ্ধিভ্রষ্ট করা ভাষা শুনিয়ে, বোধহয় সম্মোহিত করে ফেলেছিল, তাই সুবোধ ছেলের মত বাজি হয়ে গেলাম। ফিং ঠিং চট্ মন্ত্র পড়ে, আঁকুড়-পাঁকুড কি সব গাছ-গাছড়া মিশিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল, কুকুর-দংশন-দুষ্ট আমার শ্রীচরণকমলকে যেন বানিয়ে দিল কদলী বিশেষ।

প্রাণের আশা ছেড়ে দিলে, তবে বোধহয় সভ্যসমাজের লোক এই সর্বজ্বহব বৈদ্যরাজের আশ্রয় নিতে পারে। বুঝলাম, তার ফল যে অশুভ হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সভ্য সমাজের বিজ্ঞান-বিদগ্ধ মন নিয়েও স্বপ্নদত্ত মাদুলির মত রহস্যজনক ব্যাপার স্বীকার করতে হল। রাতারাতি সুস্থ হয়ে উঠলাম, ক্ষত শুকিয়ে উঠল, গায়ে জোব পেলাম। তবে

কিছুদিন যা বিপদ গিয়েছে, তা ভাষায় বোঝান দুষ্কর। আপনারা হয়ত শুনে হাসবেন, কাল্পনিক ভয়ে সেই চরম গ্রীষ্মের দিনেও স্নান করতে যেতাম না, জল দেখার সম্ভাবনা উপস্থিত হলেই চোখ বুঁজিয়ে ফেলতাম, মনে হত, বুঝি বা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষেপা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসছে কামড় দিতে। একদিন খাওয়া দাওয়ার শেষে অসাবধান বশতঃ খাবার জলের গেলাসে চোখ পড়ে যেতেই আঁতকে উঠি; মুখ ফুটে বলতেও লজ্জা হয়, যে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার আয়োজন করেছিলাম।

রামজী-প্রতিপালিত দারোয়ানজী, সত্যি ভাল লোক, চারপাইচ্যুত করা ত দূরের কথা, সহানুভূতি ও সেবা দিয়ে কয়েকদিন সাহায্য করেছে। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

* * *

বেশী দূর এগোন সম্ভব হল না। কাছাকাছি এক গ্রামের ধর্মশালায় রাত কাটিয়ে দিলাম। গৃহপ্রবেশ করতেই কিচির-মিচির শব্দ করে, মাথার ওপর দু-চারবার পাক খেয়ে, ঘরের কোণ থেকে পক্ষীরাজ সম্বর্ধনা জানাল, বাধ্য হয়ে ধর্মশালার নামকরণ করতে হল 'চর্মচটিকা শালা। সিংহদ্বার পেরিয়ে যে চত্বর পেলাম, মনে হল, বুঝি বা আগাছা সুশোভিত সুন্দরবনে এসে পড়েছি। সরু একফালি চাঁদের আলোয় ইন্দ্রপ্রস্থের সে প্রাসাদপুরী উপলব্ধি করতে হল। বৃদ্ধ দারোয়ান বোধহয় কুম্ভকর্ণ বা রিপ ভ্যান্ উইংকলের সমগোত্রীয়, আমাদের আগমন বার্তা তার অন্তরে বা অবয়বে কোথাও সামান্যতম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারল না, কেবল পরম স্বস্তিতে একবার কাত ফিরে নিল। বিশেষ হাঁকাহাকিতে বিরক্ত হয়ে জানাল, আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে এক নম্বর থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল ঘর উন্মুক্ত-দ্বার, তালাচাবি লাগান ভেবে চিন্তিত হবার কিছু নেই, সে প্রাসাদের দরজা-জানালাগুলো পাক-প্রণয়নে জ্বালানির কাজ করে; শুধু দারোয়ান কেন, পাড়া প্রতিবেশীদেরও সজাগ দৃষ্টি আছে এর ওপর।

তবু আমাদের আশ মেটে না; বলি দয়া করে সামান্য সময়ের জন্যে যদি একটা আলোকবর্তিকা···এবার বুদ্ধির অভাব দেখে হেসে ওঠে—কত আর বলব, মনটা তোমাদের নেহাতই কালো, তাই সামনের জাজ্বল্যমান 'লাল আলো' নজরে পড়ে না।······নবাবী চালের সাজ-সরঞ্জাম সবই আছে, তবে কিনা কেরাসিন আনার টিনটা ফুটো হয়ে পড়ে আছে কয়েকমাস, ফাণ্ড সর্ট বলে সারান হচ্ছে না।···আর একটা কথা, বুড়ো হাবড়া দেখে খাটিয়ার দক্ষিণা না দিয়ে পালিয়ো না যেন, সামনেই পুলিশের ফাঁড়ি।

বলি—এক কাজ করলে হয়, শয়ন-দক্ষিণাটা পুলিশ মারফৎ আদিপর্বে সেরে দিলেই পার, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

দেশীয় রাজ্যের ঠাটবাট দেখে কেমন যেন একটু শ্রদ্ধা জেগেছিল, তার কিছুটা এই ধর্মশালার কথা স্মরণ করে বিদায় নিয়েছিল, অবশিষ্টটুকু উবে গেল, রাজপথে দুর্ভোগের গার্ড অফ অনার লাভ করে। জি টি রোড ছাড়লেই পথদেবতা বেদবাক্য শোনান, পান্থ বিজন অতি ঘোর, মনেহয় সাইকেলে এই পথ চলতে প্রেরণা দেবার চেয়ে মৃত্যু অমৃত কর দান। নিতান্ত কলম ভেঙে ফেললেও এক লাইন কবিতা বেরোয় না, না হলে সত্যিকারের মন্দ-কবি যশপ্রার্থী হয়েও জি টি রোডের বিরহে একটা নবমেঘদূত লিখে ফেলতাম।

লুধিয়ানা

লুধিয়ানার দিনটি স্মরণীয়। সেদিন ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৬। এখানে এসে প্রথম কানে গেল, কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কি একটা রাজসিক হাংগামা হয়ে গেছে। আসলে কি যে হয়েছে, তার বিবরণ কারও কাছে পেলাম না। কেউ বলে, হিন্দু-মুসলমানে লড়াই, কেউ বলে পুলিশ ও

পাবলিকের পাঁয়তাড়া, । কেউ শোনায়, বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, কারও কারও মতে, দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, নৃশংসতা, রাষ্ট্র-বিপ্লব।

রাগ করবেন না, আমার তখন মনে হয়েছিল, এ সাংবাদিকদের মাউণ্টেন-অফ-এ-মোলহিল মনোবৃত্তির একটা নমুনা। কাড়া-নাকাড়া বাজাতে না পারলে তাদের মনে শান্তি নেই, তারা হৈ-হুল্লোড় পাকাবার জন্যেই যেন উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। তাদেব অতসী কাঁচ দিয়ে দেখা দৃষ্টিভংগী দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। দূর দূর, এই কাগজী আন্দোলনে মাথা ঘামানোর চেয়ে একটা চা-চক্র আবিষ্কার করতে পারলে কাজে দিত। কিন্তু সেবিষয়েও দেখি ভাগ্যদেবী আমাদের ওপর একান্ত বিরূপ।

চায়ের সন্ধানে বেরিয়ে যা আবিষ্কার করলাম তা আরও অদ্ভুত, পেলাম বাঙালীর মিষ্টির দোকান—বিরাট প্রাচীরপত্র ঝুলছে দোকানের সামনে, তাতে লেখা—বেংগলি স্থইট মিট। মনের অজ্ঞাতে কল্পনার জাল বিস্তৃত হযে গেল, একবার দাদা বলে মাথা গলাতে যা দেবী। দাদা যদি আবাব সদয় পরুষ হন······দিদির হাতে রাঁধা মাছের ঝোল ভাত, রসনায় জল রোধ করা দায় হল।

বড আশায় অনুপ্রাণিত হবার পর অতি বড হতাশায় বিজাতীয় খানায় কামড দিতে হল, এ নাকি ভণ্ডামি নয় ভাবালুতা। তাদের ধারণা বাঙালীর কথাবর্তা যে শুধু মিষ্টিমাখা তা নয়, বাংলাদেশের মিষ্টির মিষ্টত্ব অনেক বেশী। তাই এই বুদ্ধি ভোঁতা করা নামকরণ।

শুধু বোকা হওযা নয়, ধোঁকাও খেতে হল, তাই দুঃখ কলকাতায়ও খালসা হোটেলের নাম ডাক আছে। কিন্তু বাংলাদেশের সুদূর প্রান্তে, ধুতি-চাদর পরে বাঙালীরা খালসা হোটেল খুলেছে, এমন প্রমাণ আজও পাইনি।

জলন্ধর

বেলা দুপুরে পৌঁছলাম জলন্ধর। সহর প্রদক্ষিণ ব্রত তখনও উদ্‌যাপিত হয়নি, আদিপর্ব অর্থাৎ আশ্রয়ের অনুসন্ধান চলেছে। আজ আমাদের আকাংখা প্রায় দুরাকাংখার স্তরে ঠেকেছে, বামুনে গরুতেও আজ মন উঠবে না, দুধ ও তামাক উভয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ। কিন্তু হায়! কমলাকান্ত ও প্রসন্ন গোয়ালিনীর দিন গত হয়েছে, বিনা দক্ষিণায় সমাদর করবে, সে আশায় থাকলে উপবাস করা সার হবে।

চিন্তায় জর্জরিত ছিলাম বলেই বোধহয় হঠাৎ সাইকেলখানা তার কর্দমাক্ত হাতে পথের একদল যুবককে স্পর্শ করে আত্মীয়তা জানাল। হাতে হাতে ফল, তাদের লম্বা-চওড়া হাতের সদ্‌ব্যবহার না করে ছাড়বে না।

আবার পট পরিবর্তন হয়। সাইকেলের সামনে আঁটা ট্যুরিষ্ট তকমা তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দেই; পরিচয় শুনে শ্রদ্ধায় গদ গদ হয়। এবার কিন্তু জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি করে, অত্যন্ত সমীহ এবং সন্দেহ-সংকুল প্রশ্ন এল—আপনারা কি কমিউনিষ্ট পার্টির লোক?

লাল ঝাণ্ডার জয়গান গাইনি, আলু-থালু চুলে বা জামার আস্তিন গুটিয়ে ইনক্লাবী ধাঁচে চলছি না, তবে কেন এই অমূলক সন্দেহ? আবার ভাবি, এরা প্রগতিপন্থী শিক্ষিত যুবক বলে মনে হয়, বিরাগের পরিবর্তে অনুরাগও থাকতে পারে—আজকের মত একটা মন ভোলানো কথা বললে কেমন হয়? উঁ-হুঁ, সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার জন্যে পিঠ বাড়িয়ে লাভ নেই, অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে কোথাকার তাক কোন বিপাক সৃষ্টি করে, অমন রিস্কি স্পেকুলেশন করে লাভ নেই। তাই বললাম, গার্ডেন পার্টি, টি পার্টি, ডিনার পার্টি, সব তাতেই আমাদের সমান আগ্রহ; ক্যাবারে বল, আ-লা-কারতা বল, ককটেল বল, তাতেও আপত্তি নেই; তার থেকে জটিল-কুটিল

কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারি, আমরা রামানুজ ভক্ত, অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী—পর্যটক ছাড়া কোন দ্বিতীয় ধর্মে আমাদের আস্থা নেই।

যত অপবাদ দেই না কেন, ইংরাজী ভাষার সুযোগ-সুবিধা প্রচুর। যে কথা বাংলা ভাষায়, বলতে গেলে হিম-সিম খেয়ে যাবেন, আপনার আবলুশ মার্কা কালো কান দুটোও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে, ইংরাজী ভাষায় অনায়াসে তা বলে দিতে পারেন। তাই নির্বিকার হয়ে বললাম, আমরা একটা আশ্রয় খুঁজছি, যে আশ্রয়ের মানে ফুড এণ্ড লজিং।

তারা সে প্রস্তাবে রাজি হল। কিন্তু গোল বাধল ধর্মশালায় গিয়ে। ধর্মে মালিকদের অসীম মতি, তাই কুরুক্ষেত্রের বিনিময়েও তিলার্ধ স্থান দিতে নারাজ—সুযোধন কি দুর্যোধন এল, সে কথায় তারা কর্ণপাত করবে না। যদুকুল-তিলকের নারায়ণী সেনা কর্মক্ষম কলের পুতুল হতে পারে, কিন্তু দশজন শক্তিশালী যুবক মারমুখী হলে, সে বাহিনী রোধ করে কে?

এরা বলে, বিদেশী এসেছে, প্রচুর জায়গাও রয়েছে, কেন আশ্রয় দেবে না? কর্মকর্তারা বলেন, আমাদের পাঁঠা যদি ল্যাজের দিক দিয়ে কাটি তোমরা বলবার কে? শেষে ঘরদোর খোলা না পেয়ে ছেলেরা ম্যানেজারের আস্তানায় আমাদের বসিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাতব্বরের মাতব্বর হাজির, বলেন, কেন অনধিকার প্রবেশ করেছ, কইফিয়ৎ দাও? সানুনয়ে জানাই, আমরা নিরীহ ব্যাচারি, ঘাড় ফুলিয়ে বা ঘুঁসি পাকিয়ে দখল করেছি বললে সত্যের অপমৃত্যু ঘটান হবে। অনধিকার প্রবেশ কি বলছেন? পুরোপুরি অধিকার থাকলেও পরিচিত বাড়ীতে প্রবেশ করতে আমাদের হাত-পা কাঁপে, সাতবার ইতস্ততঃ করতে হয়, এ হেন ভীরু মোরা। এখন আপনারাই বলুন, একদল ষণ্ডামার্কা যুবক এখানে থাকবার জন্যে হুকুম চালিয়ে গেল, তাদের কথা অমান্য করি কোন সাহসে?

বুঝল এ বড় শক্ত ঠাঁই, তাই সশ্রদ্ধায় অন্য একখানি ভাল ঘর খুলে দিল।

আসলে এ এক রহস্যজনক ব্যাপার! এখানেও ব্ল্যাক-মার্কেটিং। ধর্মশালাটা ষ্টেশনের গায়ে। ব্যবসায় উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম ঘটে। সুতরাং ভীড় একটু অস্বাভাবিক ভাবে বেশী। প্রতি চারপায়ার ভাড়া হল এক আনা, মিটারে ঠিক এক আনাই উঠছে, আসলে গরজ বুঝে চার আনা, আট আনা, এমন কি এক টাকাও আদায় করে। এই ব্যাপারে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বড় মধুর। শ্রীকৃষ্ণের ভারতে কৃষ্ণ-বাজারের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে চলবে কেন? একজন না হয় দেশের সেবার জন্যে বোকামি করে অর্থব্যয় করে গেছে, তাই বলে বংশ পরম্পরায় সেই বোকামিতে ডিটো দিয়ে যাবে কোন লজ্জায়?

* * *

জলন্ধর নামের তাৎপর্য খুঁজতে খুঁজতে এক তরী এসে মনের ঘাটে নোঙর ফেলে। জানাই, জলন্ধর নামে একজন অসুর ছিল; তার প্রচণ্ড শক্তি, এমন কি বাহুবলে একবার স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। তখন দেবকুল মহাসন্ত্রস্ত হয়ে মহাদেবের শরণ নেয়। মহাদেবকে দেখলে মনে হয় একজন আপন-ভোলা লোক, মথাটা ছিটে ভর্তি, পঞ্চরঙ চড়িয়ে নেশায় সদা মশগুল, কিন্তু তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ এবং মারণাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও বটে। তাই দৈত্যরাজকে দেহরক্ষা করতে হল। হুড়ুম-হুড়ুম করে কাজ না করে যদি ঠাণ্ডা মাথায় শিবতুষ্টির বিধান করে এগোত, তাহলে আর এ হাংগামায় পড়তে হত না।

আজ সেখানকার লোকেরা দৈত্যরাজ সেই জলন্ধরের মত অনভিজ্ঞ নয়; অর্থ দিয়ে, মিষ্টিমুখ দিয়ে ধর্মশালার মালিককে সন্তুষ্ট করে আশ্রয় পাবার আশায়। তবে ধর্মাচরণে আমাদের বিপরীত পদ্ধতি দেখে আশ্চর্য হয়, শেষে সফলতা লাভ করায় সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

আরও একটা কথা জেনে রাখতে পারেন, সে জলন্ধর অধিবাসীরা আজ শুধু যে দুষ্কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তা নয়, সমগ্র ভারতবাসীকে বোকা সাজাবার বৃত্তি নিয়েছে। পোষ্টবক্স দিয়ে প্রচারিত বিশেষ বিজ্ঞাপন নজর পড়েনি, এমন লোক বোধহয় বিরল। পাঁচ টাকায় ২৫ দফা জিনিষ—হাতঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, ক্যামেরা···ইত্যাদি।

সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে গিয়ে সরল ও অল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষে অর্থ-দণ্ড দেওয়া খুব স্বাভাবিক, এমন কি সহুরে শিক্ষিত লোক এ কলে আটকে পড়েনি, একথাও জোর করে কেউ বলতে পারে না।

একটু নির্জন জায়গায় বসে ছিলাম। পা টিপে টিপে এক সেপাই আমাদের পাশে আস্তানা নেয়। সেপাই পিছু নিল কেন? ঘাবড়ে গিয়ে খুব অন্যায় হয়েছে কি? ধর্মশালার ম্যানেজার উপযুক্ত ওষুধ দেবার জন্যে লেলিয়ে দিতে পারে। অসাবধানে একটা বন্দুকের খোঁচা মেরে দিলে, কি করতে পারি? কিন্তু ওর মুখখানিতে কেমন যেন কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ ভাব।

—আপনারা কি বাঙালী?

—তা ঠিক ধরেছেন। তবে যদি কিছু মনে না করেন ত বলি—বাঙালী হওয়া গুণের না দোষের?

—কি যে বলেন? আপনারা হলেন নেতাজীর দেশের লোক।

তাঁর দেশের লোক সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, তবে তিনি শুধু বাঙালীর নন, সমগ্র ভারতের।

—না-না, আমায় ভুল বুঝবেন না, আমিও সেই কথাই বলতে চাই।

কথা কাটাকাটির পর আলাপ-আলোচনায় কেমন যেন আত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে; তবে ঠিক বুঝলাম না, কেন স্বজাতির ওপর তিনি খড়্গহস্ত? তাঁর হাতে কার্টিজভরা বন্দুক দেখে সত্যি ভয় হয়েছিল, রাগের মাথায় দেশের লোককে মেরে-ধরে না বসেন?

তিনি বলেন—কি দেখতে এ পোড়া দেশে এলেন?

—এমন সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা দেশ যদি পোড়া আখ্যা পায় তাহলে…।

বোধহয় খেয়ালই ছিল না, আমি কথা বলছি। একটু উত্তেজনা নিয়েই শুরু করেন—দেশে ফিরে বদনাম দেবেন ত আমাদের? বলবেন, এদের শিক্ষার কোন বালাই নেই—সংস্কৃতির ধার ধারে না, প্রফেশন বল, দক্ষতা বল, ছিল ওই হাল-চাষে। বৃটিশের নেকনজরে পড়ে আজ হয়েছে সামরিক জাত—মারশাল নেশান। দু-দশজন হোমরা-চোমরা হয়েছে, 'ফিতে' আর 'তারা' পেয়েছে, তবে অধিকাংশের বরাতে ওই ঘাস-বিচালি করা সার। সরকার আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়, একটু দরাজ হাতেই তাদের ধন-দৌলত বিলি করেছে। দুটো কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, সব বিষয়ে কুছ্-পরোয়া-নেই ভাব, সবাই যেন এক-একজন ক্ষুদে ফুয়েরার। এদিকে বিদ্যের দৌড় বোধহয় ক-লিখতে-কপাল-ফাটা গোছের। এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানে চিঠি পড়ে দুশ্চিন্তা দূর করার মত লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। পাঁচ-সাতটা গ্রাম পেরিয়ে দু-চার দিন বাদে অর্থোদ্ধার করার সৌভাগ্য হয়।

তাঁর বিরাম-বিহীন তীক্ষ্ণ বিবরণে বাধা দেবার আশায় কথা পাড়ি—আপনার শেষ কথাটা সম্বন্ধে বলতে পারি, একেবারে নির্ভুল; আর এ গুণে একাধিপত্য সমগ্র ভারতের। সে কথায় কান না দিয়ে পূর্ণ উদ্যমে তিনি আর এক অধ্যায় শুরু করেন।

মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর ব্যাসকাশীর অবস্থিতি। সে ত্রিশূল নিশ্চয় কাশীবাসীদের বক্ষভেদ করার মত তীক্ষ্ণ নয়। সেখানে মৃত্যু ঘটলে পরজন্মে গাধা হবার আশংকা থাকলেও জীবন্ত অবস্থায় অস্ত্রবিদ্ধ হবার আতংক থাকে না। কিন্তু পর্যটকদের তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলের মাথার ওপর চলে ফিরে বেড়াতে হয়, অসাবধান হলেই…। আরও আছে, বিনা প্রতিবাদে লোকের গর্দভ-রাগিণীতে কর্ণপাত করতে হয়, বাধা দেবার ইচ্ছে থাকলেও

উপায় থাকে না এবং নিজেরা উচ্ছাস প্রকাশে উদগ্রীব হলেও মনের আবেগের লাগাম টেনে ধরতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে অসুবিধে হল, ভদ্রলোককে বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অসম্ভব কি, কথা দিয়ে কথা বের করে নেবার মতলব, লোভ দেখিয়ে ল্যাং মারার প্রচেষ্টা। না, ওসব ঝন্‌ঝাটের মধ্যে আমরা নেই। ভাল বল ভাল, খারাপ বল খারাপ, মতামত প্রকাশ—নৈব নৈব চ।

*　　*　　*

বেশ বুঝেছিলাম, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে আমাদের রেহাই দেবে না, যে রকম পিছু ধাওয়া করেছে। বিকেলে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সংগের সাথী হয়ে পথে পা বাড়াল।

এবার তাঁর অন্তরের পরিচয় পেলাম, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, এখন নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। গত মহাযুদ্ধে তিনি বর্মার রণক্ষেত্রে ছিলেন বহুদিন। সে সময় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাই আজও অনু-তাপের অনল-জ্বালায় দগ্ধে বেড়াচ্ছেন। প্রায়শ্চিত্তের ফল লাভ হবে জানলে, আজও তিনি গোলাগুলির খেলা ছেড়ে হরিনামের মালা জপ করতে পারেন। ভাব প্রকাশ করেন, ভারতের সর্বনাশের মূলে যে সকল ভারতীয় আছে, তিনি যেন সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। শেষে জোর গলায় বলেন—একনিষ্ঠ রাজভক্তির নমুনা যদি দেখতে চান, তা পাবেন পান্‌জাবী আর গুর্খা সৈন্যদের মধ্যে। ছুটকো দেশের কথা, দশের কথা ভাববার অবসর তাদের নেই, তারা জানে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। প্রভুপদে এতখানি অচলা ভক্তি যদি তাদের না থাকত, ভারতের ভাগ্যলিপি বদলে যেত।

আমি প্রতিবাদ জানাই—ভুলে যাচ্ছেন কেন, এই পান্‌জাবীরাই ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর মেরুদণ্ড। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিদেশ-বিভূঁয়ে তার আত্মত্যাগ অতুলনীয়।

বন্ধু যেন আজ মহা উদারতায় অনুপ্রাণীত হয়ে ওঠে, ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করবে, গুর্খার মত দেশপ্রেমিক হয় না। বলে—বলভদ্র সিং-এর নাম জানেন? কি করে জানবেন, তিনি মহামহিম রাজাধিরাজ ছিলেন না, ছিলেন সামান্য দলপতি। একবার নেপালরাজকে সায়েস্তা করতে বৃটিশ-সিংহ বিপুল বাহিনী নিয়ে চলেছিলেন—শিখণ্ডি ভীষ্মকে কাবু করে দেবে এ ধারণা করাই অন্যায়, তবু সে অসম্ভব সম্ভব হল। এক পাহাড়ের মাথা আশ্রয় করে দিনের পর দিন সুসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে। অনাহারে-অনিদ্রায় দিন কাটিয়েছে, মাথা গোঁজবার মত একটা ছাউনী পায়নি, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেছে এককোটা জল মেলেনি; তাদের চতুর্দিকে কেবলমাত্র একটা সামগ্রী ছিল যার নাম করা যায়, তা হল তাদের সংগীদের বিকৃত-গলিত শব। সেই কারণেই বোধহয় প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা এত আনন্দ বোধ করত।

এই যুদ্ধের আর একটা ক্ষুদ্র ঘটনা শুনুন, এক গুর্খা বিপাকে পড়ে আত্মসমর্পণ করল, গোলাগুলিতে দাঁতকপাটি উড়ে গেছে, নাক-মুখ গেছে থেঁতলে। ইংরেজ চিরাচরিত প্রথামত দানাপানি দিল, তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করল। সেরে উঠলে আর কিছু না হোক শত্রুপক্ষের আঁত-ঘাঁত-গুলোও জানা যাবে। কিন্তু এক লোভনীয় প্রস্তাবের উত্তর আসে—এই অভাজনের ওপর আপনারা এত নির্দয় কেন? যদি আজ্ঞা হয়, আমি আপনাদের সেবায় সব কিছু করতে পারি, কিন্তু স্বদেশ-দ্রোহিতা করতে অনুরোধ করবেন না।

ঘুরতে ঘুরতে সহরের প্রান্তে এসে পৌছলাম। এক ফাঁকা জায়গা দেখে বসলাম তিনজনে। অনেক গল্প হল, এতক্ষণে যেন প্রকৃত প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরী হল। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ অসীম; কিন্তু তার থেকেও বেশী আগ্রহ, কবে এই পোড়া দেশ সোনায় ভরে উঠবে, শক্ত-মজবুত ইস্পাত দিয়ে ভাঙবে সোনার শেকল, প্রভুত্বের অবসানে

গড়ে উঠবে জনগণের আপনার দেশ—অশেষ দুঃখ-দুর্ভোগ ভুগতে হলেও চাই স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে।

পরিচয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার, কিন্তু কি জানি কেন, আমাদের ওপর তাঁর এত অনুরাগের সঞ্চার হল, প্রাণ উজাড় করে তবে তিনি শান্তি পাবেন। বলেন, একটা অনুরোধ জানাব, তবে তার আগে আশ্বাস দিতে হবে তা রক্ষা করবেন।

তিনি লোক ভাল এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু না জেনে কথা দেওয়া, এ বড় ফ্যাসাদ! ভেবে দেখলাম, ঘনিষ্ঠতার মেয়াদ আর কতটুকু, নিমরাজি হতে আপত্তি কি? ঘটনাটি বললেন, এবং অনুরোধ জানালেন যদি কোন দিন ভ্রমণকাহিনী লিখি, তার মধ্যে অন্ততঃ একটু ছোট স্থান যেন সে লাভ করে।

* * *

১৯১৭ সাল। যুদ্ধ চলেছে ইংরাজ আর জার্মাণীতে। ভুল হয়ে গেল, যুদ্ধ নয় মহাযুদ্ধ। মহারথীরা যেখানে পার্টনার এমন কথা বললে অপমান করা হবে। স্বয়ং মহাপ্রভুর যখন আবির্ভাব হয়েছে, সাংগ-পাংগরা আসবেই—অন্যান্য বহু দেশের সংগে লাইন দিয়ে ভারতবর্ষও গিয়েছে। একে নাকি বলে, হাতে হাত মেলান। তবে ইংরাজ আর ভারতীয়দের মধ্যে সামঞ্জস্য—একজন সেপাই-এর সংখ্যা ভারী করেছে, আর এক দলের অফিসারীতে একচেটিয়া অধিকার। বর্তমান আখ্যানের পাদপীঠ হল মেসোপোটেমিয়ার রণক্ষেত্র। চলেছে সম্মুখ সমর—হাতাহাতি যুদ্ধ। হঠাৎ এক সাহেব আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, শত্রু-সেনা আরও এগিয়ে আসছে। সেপাই গুরুদিৎ সিং দেখল তার প্রিয় তরুণ অফিসারের দুরবস্থা। সে নিজেও আহত হয়েছে, তা হোক, সে কিছু নয়, দাঁড়িয়ে ওঠে মনের জোরে, ফিরে পায় তার স্বাভাবিক শক্তি, ক্ষিপ্র গতিতে তাকে কাঁধে তুলে নেয়, সমরক্ষেত্রে দেবতার নির্মাল্য যে বন্দুক, সে রক্ষাকবচও

ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তার নিজের জীবনের কথা ভাবে না, তার বিনিময়ে যদি অফিসারটির জীবন রক্ষা করতে পারে, ভগবানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ছাউনীতে নিরাপদেই সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, তবে গোটাকয়েক গুলি নিজের শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। জানে না তারপর কি ঘটে গেছে, হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখতে পেল তার জীবন বাঁচাবার জন্যে একটি হাত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বীরত্বের সম্মান আছে সৈন্যবাহিনীতে কিন্তু বীরত্বলব্ধ পংগুতা সৈন্যবাহিনী বরদাস্ত করে না। সে বাহাবা পেল বহু লোকের, যাদের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, এমন বড় বড় সমরনায়কের অভিনন্দন পত্র পেল, তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে পেল পুরস্কার; কিন্তু চাকরীটি হারাতে হল। অবশ্য তাতে গুরুদিৎ সিং-এর কোন দুঃখ নেই। অংগহীন হয়ে দেশে ফিরে এলেও তার গর্বোন্নত শির—কর্তব্যকর্মে তারা জান দিতে পারে কিন্তু জাতির মান খুইয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করে না। বিপদকে নির্ভয়ে বুক পেতে নিতে পারে কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। বাড়ী ফিরে সযত্নে তুলে রাখে বীরত্বের পুরস্কার, মানপত্র। এমন কি সামরিক পোষাকগুলোও পাটে পাটে সাজিয়ে রাখে।

বহুদিন কেটে গেছে। ঘরের ছেলে ঘরেই আছে, অতীতের স্মৃতি প্রায় ভুলতে বসেছে, কালে-ভদ্রে ছোটদের তাগিদে শোনায় তার জীবনস্মৃতি—সে কথা বলতে বলতে কেমন যেন আজও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, প্রাণে জাগে শিহরণ।

সেদিন পথে যেতে যেতে আশ্চর্য হয়ে যায়, আরে ফিলিপ্‌স সাহেব চলেছে না? চোখ দুটো ভালো করে মুছে নেয়—হ্যাঁ তাই ত! পায়ে খুব চোট লেগেছিল, লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে; দেখলে মনে আনন্দ হয় না? ওর জীবনকে সে রক্ষা করেছে। ভাবে

বিভোর হয়ে সে এগিয়ে যায়, একেবারে ভুলে যায়নি পদক্ষেপ, মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে গিয়ে স্যালুট করে।

সাহেব একবার অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি হেনে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কথা খরচ করে সময় নষ্ট করবে—এমন বোকামি তারা করে না। গট মট করে এগিয়ে যায়। একটু ঘাড় বেঁকিয়ে শুধু চোখটি নেড়ে তাকে চিনতে পেরেছ, একথা জানিয়েও অনায়াসে ওকে কৃতার্থ করতে পারত!

আশার শিখর হতাশার ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। দুঃখ-গ্লানিতে ভরে যায় গুরুদিৎ সিং-এর মন—যার জন্যে এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে যার জীবন রক্ষা করেছে, তার এই প্রতিদান!

পরমুহূর্তে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়, না-না সাহেবরা কৃতজ্ঞ জাত—গুণীর গুণকে ওরা চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেছে—জাতি হিসেবে সেদিক দিয়ে ওরা আদর্শ। এ হতে পারে না, কোথাও একটা গলদ রয়ে গেছে··· নিশ্চয় সাহেব তাকে চিনতে পারেন নি। তাহলে কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর পক্ষে চিনতে না পারাই স্বাভাবিক, কত দিনের ব্যবধান, স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন হয়েছে, তা-ছাড়া তিনি নানান কাজের লোক।

সেই দিনই তোরংগ খুলে বের করে সেই সব পুরোনো পোষাকের তাড়া, ওঃ, কি বিশ্রী ভাঁজ পড়ে গেছে বহু দিনের অব্যবহারে। ধোপদুরস্ত করে নেয় এক দিনেই; মেডেলগুলো ছাই আর লেবুর রস ঘসে চকচকে করে। লম্বা রিবণে ঝুলিয়ে দেয় একটার পর একটা। ভাঙা আরশির কাঁচে যতটা পারা যায় দেখে নেয় মূরত্তিখানি······সে যেন বিশ বছর পেছিয়ে গেছে, সদ্য প্যারেড-পিটি সেরে ফিরছে—এবার সাহেব নিশ্চয় চিনতে পারবে—আত্মগর্বে নিজেই কেমন যেন মোহিত হয়ে যায়।

পরদিন আবার সেই সময় অপেক্ষা করতে থাকে সাহেবের পথ চেয়ে, কখন তিনি যাবেন সেই পথ দিয়ে। আজ সে সামনা-সামনি এসে দাঁড়ায়, সশব্দে প্রভুপদে আত্মনিবেদন করে—পরিচয়টা জানিয়ে দিতেও ভুল হয়

না······একটা সজোরে ধাক্কা খেতে হয়, তারপর আসে অভিনন্দন—শুয়ারকা বাচ্চা, হাট যাও রাস্তাসে।

পরিশিষ্ট অবশ্য সেপাই সংগীর কমপ্লিমেণ্ট—তারা আর কি সম্বর্ধনা পাবার যোগ্য বলুন! নিজের মাকে পরের ঘরে বন্দী রাখার জন্যে যারা অত্যন্ত কুশলী, সেজন্যে ভাই-এর বুকে গুলি চালাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, জাতিতত্ত্বে এই ত তাদের প্রকৃষ্ট পরিচয়—আমাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই।

—শুনুন, ফটোগ্রাফারদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে, 'গ্র্যাস ইস গ্রীণার অন দি আদার পার্ট অফ দি রিভার'। কবিগুরুও জীবন-দর্শন টেনে সেই কথাই বলেছেন, নদীর এপার এবং ওপার দু-জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যা কিছু সুখ সবই অপর পারে। আসলে হয় হতভাগা কেউ নয়, না হয় সকলে। কিন্তু আমার বক্তব্য, আপনি কি চাকরীর মায়া ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, সেটাকে খরচার খাতায় লিখে রেখেছেন? বলা বোধহয় প্রগল্‌ভতা যে এই কথাবার্তার গন্ধ মহাপ্রভুদের কাছে গেলে, মহাষ্টমীর মহাভোগে ব্যবহৃত হবেন; শুধু চাকরীটি কুচ্ নয়, ভরা দুপুরে বিরাশি মণ ঘাড়ে নিয়ে পেড্‌কা চক্কর মেরে কুচ-কাওয়াজ করতে হবে।

—আমার ট্র্যান্‌সমিশন যে পক্ষ রিসিভ করছেন, তাতে সরকারী তক্‌মা আঁটা নেই এবং প্রতিষ্ঠানটি নির্ভরযোগ্য, যে বাঙালীরা দেশের জন্যে কত বড় আত্মদান করেছে, তাদের অনায়াসে এটুকু বলে বিশ্বাস করা যায়।

বলে দিতে হয়—সর্বম্ অত্যন্ত গর্হিতম্।

* * *

ইংরাজ বড় সদাশয়. স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছে—ভারতের দরদে ভরে আছে তাদের প্রাণ, সহানুভূতি জানাতে শশব্যস্ত। সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম এই সহানুভূতির উৎস কোথায়। ভারতবাসীর মনের চাবিকাঠি ইংরাজ সযত্নে রক্ষা করছে, মনস্তাত্ত্বিক ব্যারোমিটারে রিডিং

পড়তে তাদের ভুল হয় না। সাম্রাজ্য বজায় রাখার একমাত্র রক্ষাকবচ হল সৈন্যবাহিনী কিন্তু যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তার মধ্যে যদি সে বাসা বেঁধে থাকে—যদি সুযোগ বুঝে বন্দুক উঁচু করে একবার এবাউট টার্ণ করে? তাই ঠিক করল, চাই না সুখের মনসবদারী, শেষে আমীরী চাল আঁকড়ে থাকতে গিয়ে ফকির সেজে বিদায় নিতে হবে? তার থেকে মানে মানে যদি একটু সরে দাঁড়ান যায়, যাতে দায়িত্ব থাকবে না, অথচ মধু আহরণ চলবে পূর্ণ মাত্রায়—সেই ত হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সাজো সদাশয়, দাও ভারতকে স্বাধীনতা।

রাত্রে ধর্মশালায় ফিরে হেরি এক অপরূপ রূপ। সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ে হয়েছে এক সার্থক তীর্থক্ষেত্র, নাই বা থাকল কোন তীর্থযাত্রী। শ্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার দুষনীয়, এখানে বোধহয় স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ মেনে চলা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। এ স্বমহিমায় এত মহীয়ান যে সামান্য এক হাত ফাঁকা জায়গার সন্ধান পেলে, বোধহয় আর একজন মাথা গলাবার চেষ্টা করত।

হামিরা

জলন্ধর ষ্টেশনের পাশ দিয়ে চলেছি হঠাৎ চমকে উঠি, মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা। দেখি ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে স্বভাব চাপল্যে ছুটোছুটি করছে। ধরে ফেললাম একজনকে। তারাও হক-চকিয়ে যায়, এ আবার কে? কোন দেশ থেকে এল? এমন বিদেশ-বিভুঁয়ে পরিষ্কার বাংলাভাষা শুনলে, থতমত খেয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। অবাক থেকে সবাক হল, যখন দেখল তাদের বাবাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলাপ-পরিচয়ের পালা সাংগ হল। ভদ্রলোক ছেলেদের নিয়ে স্বাবাথ উপভোগ করতে এসেছেন, থাকেন কয়েক মাইল দূরে হামিরায়।

অন্য দেশে ছুটির দিনে সবাই সহর ছেড়ে পল্লী-অঞ্চলে বেড়াতে যায়, আমাদের আদর্শ পল্লীকেন্দ্রীক, পল্লী আমাদের প্রাণ, তাই ছুটির দিনে সহর পরিভ্রমণে বেরোই। প্রভাতে উঠে কার মুখ দেখেছিলাম, শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে ইচ্ছা হল, একটু আগেও ভাবতে পারিনি শুভ নিমন্ত্রণ জুটবে এবং তা সেণ্ট পার্সেণ্ট বাঙালী মার্কা ঘরে। ভদ্রলোক এক চিনির কলের একাউনটেণ্ট। বছরের মধ্যে ছ-মাস্ ফ্যাকটারিতে কোন কাজ হয় না; তাঁরাও ঠাঙের ওপর ঠ্যাঙ চাপিয়ে বসে থাকেন, কেবল সর্ষের তেল খুঁজতে কষ্ট করে বাজার যেতে হয়, তা নাহলে নাকটা স্থড় স্থড় করে। এখন সেই অবসর বিনোদনের সময়।

পরদিন সকালে উঠে যাত্রা করলাম নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশে। হামিরায় তাঁর আশ্রয়ে পৌঁছুতেই সড়কী হাতে দুই পাহারাদার তেড়ে আসে, শেষে তাঁর নাম বলতে শান্ত হয়, এক গোলকধাঁধার মত পথ দিয়ে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে হাজির হয়।

ষ্টেশনে ত্রিমূর্তিকে দেখছিলাম, এখন দেখি অষ্টবসু—এরা একটা ফুল ফ্লেজেড ব্যাটালিয়ান। এই সংসার দেখার পর অনুকম্পা জাগে শান্তনুর ওপর। তাঁরও এমনই এক সংসার হত। কি করবেন, ভদ্রলোকের কন্‌ট্র্যাক্ট ম্যারেজ, স্ত্রী গংগা দেবী যা করবেন তার ওপর রা করতে পারবেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতার সৌজন্য ভাঙিয়ে ভদ্রমহিলা সাত-সাতটা সন্তানকে অকালে জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন, না হলে বিবাগী ভীষ্মকে নিয়ে সংসারটি টিম টিম করত না; বরং গড়ে উঠত এমনই আনন্দময় সংসার।

বড়োটি বলে, আপনারা কি করেছেন? দেখবেন আমি সাইকেলে বিশ্ববিজয় করব……আচ্ছা আমায় একটু সাইকেল চড়া শিখিয়ে দেবেন? কেউ বলে, আপনারা সাঁতার জানেন? মাকে যেন বলে দেবেন না, আজ ঠিক পুকুরটা পার হয়ে যাব। দ্বিতীয় স্তরের একজন অমনি ফোঁস করে

ওঠে, খবরদার নিয়ে যাবেন না; জানেন না বুঝি, সেদিন সাঁতার কাটতে গিয়ে কি হয়েছিল?

—বিশ্বাস করবেন না, ওর সব মিথ্যে কথা, নিজে সাঁতার কাটতে পারে না কিনা, তাই হিংসে হচ্ছে।

—আচ্ছা যাওনা, মাকে বলে দিচ্ছি।

শেষে মুখ ভেঙ্‌চে বিকৃত স্বরে বলে—মে-কে বে-লে দি-চ্‌-চি।······ ওদিকে এক বিদ্যাসাগর আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে দেখি যথেষ্ট সন্দিহান, তার ওয়ার্ড বুকখানি খুলে গুরু মশাই-এর গাম্ভীর্য নিয়ে পরীক্ষা শুরু করে, বলুন ত, রাঙা আলুর ইংরাজী কি? আচ্ছা, এটা না হয় ছেড়ে দিলাম, বলুন, করোলা কি হবে, তাহলে কালো জিরে?

ছোট মেয়েটি অভিমানভরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাও ডাকছি না দেখে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল নিয়ে কাছ ঘেসে দাঁড়ায়, কচি হাতখানা দিয়ে মারতে শুরু করে, আর ভিজে গলায় বলে—আপনি বড় দুষ্টু, এখন কথা বলছেন না ত, পরে ডাকলেও সাড়া দেব না, আপনার সংগে আড়ি—আড়ি—আড়ি।

—সত্যি, বড় অপরাধ হয়ে গেছে, তোমাকে অবহেলা করলে দক্ষরাজার দশা হবে, তুমি ত আসরের মধ্যমণি।

—জান, ওরা কেমন ভাল ভাল বই পড়ে, বড় হিংসুটে হাত দিতে দেয় না; আমায় সব্বার থেকে ভাল কবিতা শিখিয়ে দেবে?

এমন সুন্দর আসরটা বিশ্রী আবহাওয়ায় ভরে উঠল। এর থেকে উল্কাপাত হলেও ভাল ছিল। ভদ্রলোক এসে বিশারদের মত সাম্প্রদায়িক দাংগা-বিপর্যস্ত মহানগরী কলকাতার রূপ বর্ণনা করলেন— তার সর্বাংগ বিভৎসতায় ভরা। পথে জনমনুষ্য নেই, নগরপালরা পালিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ে, পাহারা দিচ্ছে নরখাদকের দল। শ্মশান-শিবও উৎসব দেখে আতংকিত হয়ে উঠেছে, ডাকিনী-যোগিনীরা একটু থাকবার মত ঠাঁই

খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক দেশ নূতন জন্মলাভের জন্যে কাতর হয়ে বলছে —এতে কলংক-কলুষ পৃথিবী শুচিস্নাতা হবে, ধরিত্রীকে রক্তের ধারা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা দোষ থেকে মুক্ত করবে!

সবই জানা গেল, কেবল প্রমাণ পাওয়া গেল না যুগাবতারটির, যার নেতৃত্বে ঘটল এই ধর্মযুদ্ধ। তিনি নিশ্চয় সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি দিয়ে নিরাপদ পথে চলাফেরা করেন। যুগে যুগে মাটির মানুষের এমন যুগাবতার লাভের সৌভাগ্য হবে কিনা বলা যায় না, তবে বারেক তাঁর আগমন সম্ভব হল। ভয়ে, বিস্ময়ে, আতংকে জগৎ শিউরে উঠল।

আমাদের মনে চাঞ্চল্য দেখে ছেলেরা ঘাবড়ে যায়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি ভুলে পরস্পর চোখ চাওয়া-চায়ই করতে থাকে। আত্মস্থ হতে একটু সময় লাগে, তারপর বলি, কি হে তোমরা এমন চুপ করে গেলে কেন? কবিতা শিখবে বলছিলে না? খাতা নিয়ে এস। ঋষি রবীন্দ্রনাথকে চেন ত? তিনি দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কালো রূপ। তাই সাবধান ক'রে গেছেন, সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। যে কবিতাটা লিখে দিচ্ছি আজ ঠিক এর মানে বুঝবে না, কিন্তু জেন, ভবিষ্যতে এই হবে তোমাদের পথ। তাঁর স্বপ্নের আদর্শকে তোমরা পারবে রূপ দিতে, তাই ত তোমাদের আশীর্বাদ করে গেছেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী;
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।

... ...

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপ দহন দীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,

তব মংগল শংখ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীত-রাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলংক শূন্য।

রায়া

হামিরা ছেড়ে বেরিয়েছি পথে। জনপদ পেলেই জনগণের পদধূলি স্পর্শ করে নেই। রায়ায় নেমে ধূলিকণা স্পর্শ করার আগে পেলাম প্রাণের পরশ, এল আন্তরিক আহ্বান। বোধহয় আকৃতিতে বিকৃতি আর বেশভূষায় বিভীষিকা দেখেই সম্বর্ধনার এত বহর। পরিচয়পর্ব শেষ হবার পর শুরু হল রিনিউড রিসেপশান। ভু-বর্তন চায়ের আদেশ গেল এবং তা 'টা' সহযোগে। আমাদের আশ্রয় স্থানটি হল থানা এবং আশ্রয়দাতা হলেন স্বয়ং থানা-ইন-চার্জ।

থানার মধ্যে কথার মানা, এ অপবাদ সহ্য করতে উভয়েই নারাজ; বরং যে স্পীডে কথাবার্তা চলেছে এ যেন টপ গিয়ারের কমেট, কোন ফ্রিকশানের একশন নেই। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যায়, যেন সুললিত হপ ষ্টেপ। কিন্তু তাল কেটে গেল, মানুষের জীবনটাই একটা হার্ডল রেস, বিশ্রন্ত আলাপের মাঝে সে যদি ফেন্সিং সৃষ্টি করে, অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক দল লোক বিনা লাইসেন্সে 'বোতল বাহিনী' গড়ে তোলে তা রাম-জিন নয়, হাড়িয়া আর পচাই, সেগুলো অকসিলিয়ারী কোর হিসেবে রেস্তোঁরার শক্তি বৃদ্ধি করে, সর্বসাধারণের সামর্থ্যের অনুপাতে তার দামকরণ, বৃত্তিটা সদাশয় প্রণোদিত, কেমন যেন সেবা. দীনে দয়া, প্রলেতারিয়ার গন্ধ ছাড়ে। কিন্তু সরকার তার প্রাপ্য গণ্ডা ছাড়বে কেন, সে ত সদাব্রত খুলতে এদেশে আসেনি।

এবার সমাজসেবীর কাকুতি-মিনতি শোনা গেল, তা অপরাধীর

অনুশোচনা নয়, নিরপরাধীর আত্মনিবেদন—তারা গোব্যাচারা মানুষ, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না, অথচ এ কি গ্রহের ফের!

গ্রহশাস্তি হাতে হাতে, সেগুলো কিন্তু বায়না নয়, উপরি পাওনা। অন্য কোন সভ্য দেশে এমন অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আছে বলে শুনি নি, তবে আমাদের দেশে বিচারের আদিপর্বে চলে। আরও বড় কথা, দোষী-নির্দোষী, পাত্র-অপাত্র বিচার করার মত সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমাদের দেশে মিলবে না, আমরা যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আদর্শের ভক্ত। অবশ্য একটা কথা, সকল জিনিষের ভূমিকার প্রয়োজন হয়, না হলে প্রথম পরিচয়ে কেমন যেন অনাত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে, সেই কারণেই বোধহয় এই শুভ সূচনা।

এসব ঝামেলাগুলো আপাতত হাজত ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের সুললিত আলোচনায় ফিরে আসা যাক। বলা বাহুল্য, পরবর্তী কয়েক মিনিট গেল 'সাকীর সাথী' অর্থাৎ সুরার আলোচনায়।

আমি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় জানাই, পানীয় পান করবে তাতে দোষের কি? শিখদের ধর্মে মানা ও-কথা তোলা অবান্তর, সকল ধর্মের অনুশাসন সংস্কারের দড়ি দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা; আমাদের টিকিধারীরাও বাড়াবাড়ি করেন, তাতে অশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে আধুনিকতায় শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের মানুষ হয়ে এ কুসংস্কারকে মানতে পারব না। বৈদিক যুগেও লোক সোমরস পান করত। তবে হিংসে হয় আপনাদের স্বাস্থ্য দেখে।

—আপনি একা নন, অনেকেই তা করেন, এক ইংরাজ পান্জাবীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, জাতিতে ওরা সিংহ, বুদ্ধির দৌলতে ভেড়া বনে আছে।

একটু থেমে নিজের মতবাদ জুড়ে দেন, ওদের শক্তি ও সাহসের অনুপাতে যদি বুদ্ধির প্রখরতা থাকত, ভারতের ইতিহাস পালটে যেত।

—ওই খানেই ত গলদ। বাঙালীরা বলবে, আমাদের সবার যদি সুস্থ

সবল দেহ থাকত, এই মগজখানা দিয়ে লালমুখোদের লালদীঘি থেকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে আসতাম।

একটা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে……সত্যি অপূর্ব ?

—কি অপূর্ব ?

—বলছি, দম নিতে দিন। মহাদেব দেখলেন, তাঁর ছেলে গনেশ একেবারে গোবর-গনেশ, অথচ স্বাস্থ্য কেমন চমৎকার, হাতের সংখ্যাও চার, যদি ওই চার হাত দিয়ে লিখতে শুরু করে ?…যেমন ভাবা সংগে সংগে কাজ। ষড়যন্ত্র করে মগজখানা বদলে দিলেন—হাতীর মাথা নিয়ে সে হল জগতের সেরা বুদ্ধিমান।

মান্ধাতা আমলে মহাদেব যা করেছেন, উন্নত নব্য-বিজ্ঞানের উপাসক শল্য-বিশারদরা তা পারবেন না ? অস্ত্রোপচার করে বাঙালীর মাথাগুলো যদি পান্‌জাবীদের ধড়ে ফিট করে নেওয়া যায়……সেদিন হয়ত ভারত-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাবে না।

এবার কানু তার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুরু করে—আদিমযুগে মানুষের শরীরে ছিল অসুরের মত শক্তি—সবাই যেন এক একজন হারকিউলিস, ঐশী শক্তির প্রয়োজন হত না, এমনিতেই স্যামসন। লুই-ওয়ালকটকে তারা এক হাতে নাচাতে পারত, গামা-গোবর তাদের কাছে নিতান্ত নাবালক, ভীমভবানীকে ছেলে-ছোকরারা অনায়াসে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে পারত। তাদের হাত-পা ছিল, এপম্যানের মাস্‌ল দিয়ে গড়া, তবে মাথাগুলো দেহের তুলনায় টিম্‌টিম্ করত। মানুষ যত সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তত আরামপ্রিয় হয়ে পড়ছে। সভ্যতা বিকাশের তালে তালে মানুষের ব্রেনের পরিশ্রম যাচ্ছে বেড়ে, তেমনি তারা হয়ে পড়ছে কায়িক অলস। তাই দিনের পর দিন মানুষের মাথা আকৃতিতে বেড়ে চলেছে, আর দেহ হয়ে যাচ্ছে খর্বকায়।

আমি হেসে বলি—শেষে কি ইউক্লিডের সরল রেখার মাথায় ইলিপ্‌স

বিরাজ করবে, অমার্জিত ভাষায় যাকে বলে, খ্যাঙ্‌রা কাঠির মাথায় নৈনিতাল আলু?

—হেসে উড়িয়ে দিয়ো না বন্ধু। শ-সাহেব বলেন—জগতে এমন দিন আসবে যখন দেখা যাবে, শুধু মাথা চলেছে দেহ নেই আর চলেছে যন্ত্রদানব।

তিনি যোগ করে দেন মানি, হানি, সুইট জেনি থাকবে ত?

বলি—সুবিধে পেলে তাও শেষ করতে কসুর করবে না। এর নাম বিজ্ঞান, ও-রাজ্যে ভাবালুতার স্থান নেই, যন্ত্র দিয়ে দানব সৃষ্টিতেই ওর আনন্দ, মানবতার ধার ঘেসেও যাবে না। বিজ্ঞানের গৌরবোজ্জল ফানুসে উড়ে, আগামী দিনের অলসতার আরাম ক্ষণিক স্থগিত রেখে, ব্যালেন্সড জাজমেন্টকে একটু শ্রদ্ধা জানালে হয় না? অ্যাটম বম্‌ব, তার থেকেও বিভীষিকাময় প্রোটোন বা ইলেকট্রোন বম্‌ব তৈরী হোক, তাতে আমরা গৌরব বোধ করব। তবে সে বোমা ফেলতে গেলেও শক্তি চাই, শক্ত-সমর্থ দেহধারী পাইলট চাই?

—যা বলে ফেলেছ তার কোন উপায় নেই; আর এক কদম এগোলে বুদ্ধিজীবীর সমাজে কল্কে মেলা ভার হবে। এও বলে দিতে হবে, সেদিন প্লেন চলাতে রক্তমাংস-দেহধারী মানুষের প্রয়োজন হবে না, ঘরে বসে গান শোনার মত রেডিয়ো নিয়ে বসে থাকলে চলবে, রেসিস্‌টেন্স, অ্যাম্‌পিয়ার এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করার নব্‌ ঘুরিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা করা যাবে। আর সেদিন বোকার মত মানুষ সশরীরে যুদ্ধ করতে যাবে, সেই আনন্দে আছ? অত অপদার্থ সে নয়। আচ্ছা দারোগা সাহেব, আপনি রোবটের নাম শুনেছেন?···সে হল মেকানিকাল সোলজার, যন্ত্র দিয়ে তৈরী সৈনিক। আজ তারা ইলেকট্রিকালি অপারেটেড, দু-দিন বাদে এটমিক এনার্জিতে তারা চালিত হবে—তখন না জানি কি দুর্জয় শক্তির অধিকারী হবে তারা। সেদিনকার আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্স

নিশ্চয় হবে আজকের চেয়ে শতগুণে শক্তিশালী—তারা ত আর মৃত্যুভয়ে ভীত হবে না। মায়াবদ্ধ সংবেদনশীল রক্তমাংসে গড়া মানুষ তারা নয়, আনবিক শক্তিপুষ্ট দানব।

—দেখুন, আমাদের আলাপ যে লেভেলে চলেছে, বেশ বোঝা যায়, আমরা উচ্চমার্গের লোক, জনসাধারণের গড্ডলিকা প্রবাহে কস্মিন কালেও আমাদের খাপ খাবে না, এই মস্তিষ্কহীন পৃথিবীতে আমাদের উপযুক্ত সম্মান কেউ দেবে না। তার চেয়ে চলুন, আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখি, আমরা হব চন্দ্র-রাজ্যের প্রথম স্বাধীন, সভ্য, রুচিমার্জিত নাগরিক। অভিনব রকেটে করে এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর জাল ছিঁড়ে একে ফাঁকি দেব।

সেখানে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হানাহানি নেই, মালিক-মজুরের কাদা ছোড়া-ছুড়ি নেই, ইসম্-ক্রেসির লড়াই নেই—ইন্‌ক্লাব, মৃদু লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, এসবেরও বালাই নেই—কেমন শান্ত পরিবেশ।

সে শৈল নিকেতনে চিরবসন্ত বিরাজিত, চতুর্দিকে ঘিরে আছে নগাধি-রাজ, মাঝে মাঝে নীলঘন হ্রদ। সেখানে ধুলো নেই, কুয়াশা নেই, পচা বর্ষা নেই। আছে অনন্ত সুখ-সম্ভোগ। চন্দ্রের গ্র্যাভিটি পৃথিবীর গ্র্যাভিটির মাত্র ছ-ভাগের এক ভাগ। এক সের মাছ আনলে ছ-সের মাছ পাওয়া যাবে, তিন পা হাঁটতে গেলে আঠার পা এগিয়ে যাব। নিজেদের দেহটাও মনে হবে যেন রক্ত-মাংসের নয়, শোলা দিয়ে তৈরী।

সেই চন্দ্ররাজ্যের পার্বত্য উপত্যকায় এক হ্রদের তীরে বাঁধব পর্ণকুটির। সোনা-দানা, মুক্তা-মাণিকে আমাদের লোভ নেই, তা দিয়ে হবে আঙিনার পথ। ঝাউ গাছের নিচে বসবে আমাদের চায়ের আসর, অপরাহ্নে যাব গুলবাগিচায়, সন্ধ্যায় বেড়াব হ্রদের তীরে। কেবল ভয়, দেবরাজ ইন্দ্র না ঈর্ষান্বিত হয়ে সদল-বলে সেখানে গিয়ে শান্তিভংগ করেন?

* * *

তিনি বললেন—গল্পে গল্পে বেশ বেলা হয়েছে, এবার খাওয়া-দাওয়ার

পাট চুকিয়ে ফেলুন। এখন রমজানের উপবাস চলেছে, না হলে এক সংগে বসে খাবার আনন্দ হারাতে হত না।

আমাদের ততক্ষণে চক্ষু ছানাবড়া। ভাবি, আকাশে বজ্রপাত হোক, হাইড্রোজেন বম্ব পড়াও বোধহয় এর থেকে ভাল ছিল। যাঁর সংগে বিশ্রস্ত আলাপ চলল কয়েক ঘণ্টা, তিনি মুসলমান! সেই মুহূর্তে চিন্তাস্রোত ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন নিল; ভেবে দেখছিলাম, কি পরিমাণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি।

কিন্তু তাঁর মুখে ত শুনেছি কংগ্রেসের কথা, শিখদের কথা, ইউ-নিয়নিষ্ট পার্টির কথা—মুসলিম লীগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন কথা ত শুনিনি? তিনি লীগের পক্ষপাতী নন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে কোন দলে তাঁর প্রীতি, জানার বাসনা থাকলেও মুখ ফুটে বলার সাহস হয়নি। একটা প্রশ্ন তাঁকে করেছিলাম, পান্‌জাবীদের কে হিন্দু কে মুসলমান, পোষাক দেখে কি বোঝা যায়? উত্তরে জানিয়েছিলেন, তেমন কোন 'শক্ত এবং দ্রুত' আইন নেই, ধর্মের ট্রেডমার্কযুক্ত পোষাক সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় না—শিখ-হিন্দু-মুসলমান সবাই মাথায় তাগড়াই পাগড়ী বাঁধে, বিলম্বিত শ্মশ্রু না থাকলে শিখদেরও চেঁকে বের করা সম্ভব হত না।

মুসলমানের তরফে কেবল একটি গল্প বলেন, ফকির আজিজ-উদ্দীনের কথা। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সবে লাহোর জয় করেছেন, চক্ষুরোগে আক্রান্ত হলেন। সেরা চিকিৎসক এল, ব্যবস্থাপত্র ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে লাগল, তাতেও কিছু হল না; এ যেন দুরারোগ্য ব্যাধি, সারবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেবল ক্ষীণ আশা, আজিজ-উদ্দীনের হাতে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়? কিন্তু সে যে মরার বাড়া, শ্বাস ওঠার আগে শ্মশানঘাটে টেনে নিয়ে যাওয়া! যে জাত তাদের চিরশত্রু—যাদের অত্যাচার থেকে জাতি-ধর্ম রক্ষা করার জন্যে শিখরা কৌপীন ছেড়ে কৃপাণ ধরল, সেই শত্রুপক্ষের একজনের হাতে ভার দেওয়া হবে মহারাজের জীবন

রক্ষার! এ কি ছেলেখেলা! কিন্তু জীবন যখন বাস্তবিকই যাবার দাখিল, যমরাজের প্রভিশনাল নোটিশ সার্ভ করা হয়ে গেছে, তখন একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

সে প্রস্তাব মঞ্জুর হল। আজিজ-উদ্দীনের সেবায় দিন দিন আরোগ্যের পথে ফিরতে লাগলেন রণজিৎ সিংহ। সুস্থ হয়ে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেন, পুরস্কার স্বরূপ দিলেন একখানি গ্রাম। আরও বড় কথা, সম্পর্ক করলেন চিরস্থায়ী, তিনি হলেন মহারাজের গৃহচিকিৎসক।

ক্রমে ফকিরসাহেব চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে রাজনীতিতেও ভাগ বসাতে লাগলেন, দু-দিন বাদে সে ক্ষেত্রেও হলেন মহারাজের দক্ষিণহস্ত। রণজিৎ সিংহ রাজধানী ছেড়ে বাইরে গেলে প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের ভার দিয়ে যেতেন আজিজ-উদ্দীনের হাতে। দৌত্য কাযেও প্রতিষ্ঠিত হল তার একচ্ছত্র অধিকার। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে যে প্রীতির আবরণ ছিল, তার জন্যে বহুলাংশে দায়ী হলেন ফকির আজিজ-উদ্দীন।

কর্তব্যকর্ম সেরে দিবানিদ্রার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দারোগাবাবু একখানি দৈনিক পত্রিকা পাঠিয়ে দিলেন; বহুদিন বাদে সংবাদপত্রের দর্শন পেলাম, এ নাকি সভ্যতার একটা মানদণ্ড। কিন্তু যে সংবাদ তাতে পেলাম, পৃথিবী যে সভ্যতার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তেমন অবাস্তর ধারণা মনে ঠাঁই পেল না। সাম্প্রদায়িক দাংগায় খাস কলকাতার মত সুরক্ষিত সহরে দু-হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। আচ্ছা, এদের মধ্যে আমাদের আত্মীয়-বন্ধু ত থাকতে পারে? কত বড় বৈসাদৃশ্য—আমরা আজ মুসলমানের অতিথি হয়ে রূপোর থালায় রূপোর বাটিতে মিঠাই-মণ্ডা দিয়ে ভূরিভোজ করছি, সেই মুসলমানদের হাতে আমাদের কত আত্মীয়-বন্ধু নিপীড়িত হচ্ছে!

অপরাহ্নে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে 'অমৃতসহরে'র পথে যাত্রা করলাম।

ভদ্রলোক সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। শিক্ষায়-দীক্ষায় মুসলমানদের মধ্যে 'সিংহের ভাগ' নাকি এদের, সাম্প্রদায়িকতা থেকে জাতীয়বাদিতায় তাদের সম্প্রীতি বেশী। প্রচলিত প্রবাদে বলে, তারা সুন্নি সম্প্রদায় থেকে হিন্দুকে নিকট আত্মীয় বলে মনে করে। আজ মনে হয়, এ ছিল শুধু কথার কথা, হিন্দুরা উদারতা দিয়ে বিশেষ জিনিষের সুন্দর আবরণ দিয়েছিল। পাকিস্তান তার প্রমাণ, স্বয়ং জিন্না সাহেব তার জলন্ত উদাহরণ।

অমৃতসর

নগর-উপান্তে এসেই চড় খেতে হল। তা আবার ভোঁতা নয়, সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। কেউ কেউ বলতে পারেন, বেকায়দায় পড়লে লোকে কিল খেয়ে কিল হজম করতে পারে, আর তোমার এমন বদহজম হয় কেন—তুমি কি অম্লরোগগ্রস্ত? রোগের কথা অবশ্য বলতে হবে না, তাতে একচ্ছত্র অধিকার—এ রোগ বংশজ, দেশজ এবং আবহাওয়াজ। কিন্তু এক্ষেত্রে যে ইন্‌টেলেকচুয়াল চড—ইন্‌টেলেকচুয়াল কথাটা বড্ড বড় হয়ে গেল, বরং ভৌগলিক বলা যেতে পারে। 'অমৃতসহর' খুঁজতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হতে হল, সহরটার নাম 'অমৃতসর' অর্থাৎ অমৃতময় সরোবর।

ভাবছিলাম, বলা যায় না কিছু, জনগণের অনুকূলে 'সর' যে কোন সময় সরে যেতে পারে, সহর কথাটার মধ্যে কেমন ইটারনিটির ভাব আছে। আরও মনে পড়ে, এক ইংরাজ ফরাসী দেশ ঘুরে এসে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসংগে জানান, অমুক দেখলাম, তমুক দেখলাম; তবে সব থেকে মজার কথা, ফরাসীরা অজ্ঞতার বশে প্যারিসকে বলে প্যারী। বলা দুষ্কর, ভবিষ্যতে কে অজ্ঞ বলে প্রমাণিত হবে!

এবার ফারোবিয়াসের ব্লো খেতে হল, গড়াতে গড়াতে ব্যর্থমনোরথের শেষ সীমানায় পৌছলাম। মনকে কত না আশ্বাস দিয়েছি, তোমার দুয়ার

আজি খুলে গেল সোনার মন্দিরে। কিন্তু দুনিয়ার সর্বত্র যে ভেজালে ভরপুর কি করে জানব? মেকির মেকআপ নিয়ে লোকে এত মাতামাতি করতে পারে, তা ধারণা ছিল না। স্বর্ণমৃগ আসলে মায়ামৃগ, এ বোঝবার মত বুদ্ধি নেই, সেজন্যে অক্ষমতা স্বীকার করছি। এত ঢক্ক-নিনাদিত সোনার মন্দিরে মাথা খুঁড়ে মরলেও সোনার টুকরো মিলবে না। কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে ভেবে নেবেন না, আসলে এটি সোনালী রঙের মন্দির। নামের গ্রামার আবার কানমোড়া দেয়, ওটা মন্দির নয় গুরুদ্বোয়ারা—শিখধর্মের পীঠস্থান।

সেই ছোটবেলায় ছোট বুদ্ধি দিয়ে ভূগোলে স্বর্ণ-মন্দিরের কথা পড়তাম আর ভাবতাম, শিখরা মাথায় পাগড়ী বেঁধে বেঁধে মগজকে গলিয়ে ফেলেছে। তা না হলে, দু-মুঠো খাবারের জন্যে হাড়মাস কালী করে সুদূর বাংলা দেশে পচে মরে? একটু বুদ্ধি খরচ করলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। অভাব হলেই স্বর্ণ-মন্দির দেখতে যেত, মন্দিরের রেলিং-এর টুকরো, পাঁচিল-এর কোণা ভাঙা, ঘরঝাড়া ধূলো, এক ফাঁকে নিয়ে আসতে পারলেই কয়েক মাসের মত নিশ্চিন্ত। কিন্তু এর যে গোড়ায় গলদ!

* * *

মন্দির প্রাংগণে ঢুকে সামনেই পেলাম বিরাট সরোবর, কাঁচের মত স্বচ্ছ জল টলটল করছে, চারিদিক সিমেন্ট দিয়ে বাঁধান। সেই জলাধারের মাঝে বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির। সরোবরের তীরে এক নির্জন স্থান বেছে নেই বিশ্রাম করার জন্যে। মনে পড়ে প্রচলিত গল্পটি, এক কুষ্ঠরোগী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করতে আসে; শাপে বর হল, সরোবরের অমৃতপরশে ফিরে পেল জীবন-যৌবন—জন্ম নিল পুণ্যতীর্থ।

কেন জানি না, হঠাৎ বন্ধুর দুর্বাসার বৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে, গলা চড়ে যায় হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে, বলে—অমৃত না ছাই! সব গালগল্প, ধর্মের নামে লোক ঠকানো বরং বিধর্মীর গন্ধ আছে এর ভিত্তি-প্রস্তরে।

—চুপ চুপ, কে কোথায় শুনে ফেলবে। রাগ করিস না, সোজা কথায় একে বলে, ধর্মদ্রোহিতা তথা রাষ্ট্রদ্রোহিতা—এ হাইলি সিডিশাস।

—তাহলে বলতে হয়, ইতিহাস রাষ্ট্রদ্রোহী কথায় ভরা। আসলে সাধু পুরুষের উদারতাও বলতে পার, দান গ্রহণে তাঁদের কোন দিন অভক্তি নেই; কে দিচ্ছে কতটুকু দিচ্ছে, তা নিয়ে তাঁরা অযথা মাথা ঘামান না। বাদশা আকবরের দান মাথা পেতে নিলেন গুরু রামদাস, সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হল বিরাট সরোবর, মাঝখানে দ্বীপের মত স্থানে উঠতে লাগল গুরদ্বোয়ারা, এবং তা সম্পূর্ণ করলেন রামদাসের পুত্র গুরু অর্জুন। ক্রমে এই অমৃতসর হল শিখধর্মের পীঠস্থান।

বলি—তর্ক করছি না, তবে ইতিহাসকে কেউ পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, নেপোলিয়ানও করতেন না, তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ইতিহাস আর কিছুই নয় 'লেজেণ্ডস এগ্রীড আপন'—কবিও প্রশ্ন তুলেছেন, যা ঘটে তার সব কি সত্যি?

গুরদ্বোয়ারা তিনতলা। কাঠের সেতু পেরিয়ে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে হয়। মাথার টুপিটা ভাল করে এঁটে নিয়ে এগিয়ে চললাম। নাংগাশির হয়ে ধর্মগুরুকে অপমান করলে হয়ত আমাদের ভবলীলাই সাংগ করে দেবে। প্রথম চত্বরে গান-বাজনার আসর জমেছে; অবশ্য তা আধুনিকতা দোষে দুষ্ট নয়, আমার মত অনভিজ্ঞকেও বুঝিয়ে ছাড়ে, এ ওস্তাদী পদবাচ্য। দোতলায় বস্-এর আবাস, সাহেবের খাস কামরা, সেখানে থাকেন গ্রন্থসাহেব। তাঁর প্রকৃতির পরিচয় জানি না তবে আকৃতিতে শ্রদ্ধেয়, আমায় কেউ নেড়ে চেড়ে রাখার সুযোগ দিলে, ফাঁসির হুকুমের সামিল মনে করব।

বইখানি কেবল বেদ বা বাইবেল নয়, একাধারে কেষ্ট এবং খৃষ্ট; এই গ্রন্থপূজাই শিখ ধর্মের একমাত্র গ্রন্থি। বাৎসল্যধর্মে এঁকে ভোলানাথ বলা যায়, কারণ এঁর প্রীতির জন্যে যোড়শোপচারের প্রয়োজন হয় না, শুধনো আবৃত্তিতে কাজ হাসিল করা যায়। আরও বড় কথা, আর্চবিশপ লাগে না,

পুরোহিত লাগে না। ধর্মে অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে ধর্মাধিকরণে ছুটতে হয় না। এ অনেকটা কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন, সবার সমান অধিকার। তবে গ্রন্থ পাঠ করলেই দক্ষিণা দিতে হয়, ধর্মগুরুকে নয়, গুরুদ্বোয়ারার তহবিলে। আর একটা কথা, আমি পড়তে চাই বলে গলাবাজি করে বা কৃপাণ উঁচিয়ে সিদ্ধিলাভ হয় না, টাকা জমা দিয়ে নাম এনলিষ্ট করিয়ে আসতে হয়, কিউ ধরে এগোতে এগোতে আপনার পালা এসে পড়লে আর কোন বাধা নেই। তবে প্যানেলে নাম তোলার ব্যাপারে ব্ল্যাক মার্কেটিং বা নেপোটিস্‌ম চলে কি না, সে সংবাদ সরবরাহ করতে পারি না।

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, মতবাদে পান্‌জাব-ঘরণীরা বিশ্বাসী নয়। দেখলাম, গ্রন্থসাহেব পাঠরত পুরুষদের চামরের হাওয়া দিয়ে তাদের পুণ্যে ভাগ বসাতে তৎপর—নারী অর্ধাংগিনী কোন কালে নয়, বরং অনাদি কাল থেকে সে অর্ধভাগিনী।

সরোবরের এক প্রান্তে আছে সুউচ্চ মিনার—বাবা অটলের স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি আজন্ম সিদ্ধপুরুষ। সর্পাঘাতে কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখে তিনি দয়ায় বিগলিত হন, অমৃতময় পরশে তাকে করেন সঞ্জীবিত। শেষে বোঝেন, তাঁর অন্যায় হয়েছে, বিধিলিপির ওপর কলম চালান তাঁর শোভা পায় না। তাই স্থির করলেন, জীবনের বিনিময়ে জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আত্মদানের সংকল্প নিয়ে ধ্যানে বসলেন, সেই অবস্থায় সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হল। দেশবাসী তখন ভক্তিভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, তাঁর সমাধির ওপর গড়ে এই অভ্রভেদী মিনার।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নয়, রাজনৈতিক বাদ বিচার বা বাক্‌-বিতণ্ডা শোভা পায় না; তবে ধর্মালোচনা বা গুরুর মহিমা-কীর্তন না করা নাকি বে-আইনী। আইন ভংগ করে বিদেশ-বিভূঁয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানর চেয়ে পাঠকদের ওপর অত্যাচার চালান মনোবলহীন পর্যটকের পক্ষে সহজসাধ্য।

তাই বাধ্য হয়ে আসর জমিয়ে তুলি, ধর্মভীরু পান্‌জাবী আর নাস্তিক বাঙালী মিলে।

*   *   *

জাতিভেদ মনুষ্য-সমাজে এক গভীর সমস্যা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর অসীম প্রভাব। অফিসে যাও, সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে কোন বৈষম্য দেখা না গেলেও, আসলে তার মাঝে আছে চীনের প্রাচীর—পরস্পরের সংগে জলচল নেই। দু-জনেই নামে অফিসার হতে পারে, তাই বলে ক্লাস ওয়ানের সংগে ক্লাস টু; আরে ছোঃ—রেপটাইল বলে টিকটিকি আর কুমীর সমগোত্রীয়! ভোজ সভায় যাও, কোন প্রীতি-সম্মিলনীতে যাও, দেখবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সর্বত্র বেড়ার পর বেড়া, এক জাতির ওপর আর এক জাতির মর্যাদা। মাইকেল মধুসূদনের কি হল? ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে কড়া মিলিটারী পাহারায় তিনি যীশুর মহিমা লাভ করলেন; তবু ব্রাহ্মণ-খৃষ্টানের মেয়ে লাভ করা সম্ভব হল না। শিখরা সবাই এক বলে না হয় বগু দিয়েছে, তবে তা সর্বান্তঃকরণে মানতে হবে, এমন বাধ্য-বাধকতায় রাজি নয়। গুরু নানক মহাপুরুষ, তিনি সকলের নমস্য, জনসাধারণ ছাপোষা মানুষ, তাঁর মত উদারতা দেখান তাদের পক্ষে শোভা পায় না। সমাজ-বন্ধন ভুলে যেতে হবে, লঘু-গুরু জ্ঞান থাকবে না, সবাইকে বক্ষে আলিংগন করতে হবে, এ অবাস্তব পরিকল্পনা!

গুরু গোবিন্দ মার্কস পড়েছিলেন কি না, এমন নজীর পাওয়া যায় না, তবে তিনি যে ইন্টারপ্রিটেশন করলেন, তা প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ থেকে বড়—শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য, সেবাই তার ধর্ম, সেখানে ভেদাভেদের প্রশ্ন অবান্তর। তারা খালসা অর্থাৎ অন্তর হবে নির্মল-নির্মুক্ত—কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না। আবার তারা সিংহ; ধর্ম যখন বিপন্ন হবে, ক্ষাত্রধর্ম বরণ করবে, ধর্ম রক্ষায় প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। আজ শত্রুপক্ষের সামরিক শক্তি পিছু ধাওয়া করেছে, সুতরাং কঠোর ব্রত গ্রহণ করতে হবে—

ধারণ করতে হবে কৃপাণ, কড, কচ্ছ, কাংগি, কেশ—শুধু বেণী পাকিয়ে হাতে বালা পরাটাই বড কথা নয়, সামনে থাকবে কৃপাণ, সেই কৃপাণ নিয়ে শপথ করতে হবে।

কাস্থ বলে ওঠে—এতদিন জানতাম, ধর্ম মানুষকে দেখায় মুক্তির পথ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ, সত্য ও সেবার অনুশাসন, আর শিখরা শেষে কৃপাণ চালিয়ে ধর্মধ্বজা ওড়াবে?

সংগী প্রতিবাদ করেন—ব্যাখ্যা করছেন ভাল; জানবেন এ পথ ধর্মের সোপান নয়, আত্মরক্ষার উপায়—বাঁচবার উপকরণ। প্রতিবাদ যখন করলেন, ধৈয ধরে আরও কিছুটা শুনতে হয়; বিরক্তি লাগলেও ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হবে। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ছিলেন পরম সাধক। লোকে বলত:

গুরু নানক শা ফকির
হিন্দু কা গুরু, মুসলমানকা পীর।

তিনি ভক্তি আর ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন, অশ্রু দিয়ে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একটা ছোট ঘটনা বলি: এক রাত্রে শিষ্য মর্দানাকে নিয়ে গুরুদেব মুসলমান দস্যু সজনের আশ্রয়ে উঠেছেন। সজন দরবেশের ছদ্মবেশে ডেকে এনে আশ্রয় দিত পথচারীদের, রাত্রের অন্ধকারে তাদের হত্যা করে সর্বস্ব লুঠ করত। আহারাদি সেরে গুরু নিদ্রা দেবেন, তা নয় শুরু করলেন ভজন গান, মর্দানা তুলল তারের ঝংকার—সংগীতের কি আবেশ, সে যেন ব্যাকুল ব্যাথায় কেঁদে ফেরে, জগতের ঘৃণা-কলুষতাকে ভুলিয়ে দেবে, তার সুললিত মূর্ছনায় এনে দেবে শান্ত-স্নিগ্ধ আবেশ—বিশ্বে আনবে শান্তি-প্রীতি-ভালবাসা।

এদিকে দস্যু সজন চঞ্চল হয়ে উঠে, তার সময় যে পেরিয়ে যায়, সে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে। ভাবে, সাধুটা বড় বেয়াদপ, ওর স্বরে এতখানি

মাদকতা থাকার কি প্রয়োজন ছিল, সে এতখানি সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী না হলে কি চলত না? .

ক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; তারপর যখন দেখে সংগীত-সমাহিত নানকের নয়নযুগল ভরে উঠেছে ভক্তিময় অশ্রুতে, আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, নানকের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, অকপটে বলে অতীতের দুষ্কৃতি আর মিনতি জানায়, প্রভু আমায় মানুষ হবার সুযোগ দাও।

কালক্রমে গুরু অমরদাসের সময় মুসলমানরা শুরু করে অত্যাচার—অকথ্য-অমানুষিক অত্যাচার। গুরু বলেন, পাপ দিয়ে পাপ দূর করা যায় না, হিংসা দিয়ে হিংসার অবসান হয় না, তোমাদের ধর্ম সেবা করা, সহ্য করা।

কঠোর হতে কঠোরতর অত্যাচারে শিষ্যরা অসহিষ্ণু হয়ে বলে—আর কতদিন আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে বলেন?

গুরু উত্তর দিলেন—প্রয়োজন হলে আজীবন।

তারপর মোগলের বন্দীশালায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হল গুরু অর্জুনকে। জাতির জীবনে এল সন্ধিক্ষণ, ধর্মমত যেন ভিন্ন পথের সন্ধান চাইল। সে পথের সন্ধান দিলেন গুরু হরগোবিন্দ—শিখরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবে বিনা যুদ্ধে নয়। জীবনকে তারা নিলামের দরে বেচবে না, উচ্চ মূল্যে কিনতে হবে, হার্ড কারেন্সি হিম্মতে বিনিময় হবে।

এবার গুরুর বিপদসংকুল আসনে ডাক পড়ল তেগবাহাদুরের, তিনি সাধুসন্ন্যাসী মানুষ, কোন হাংগামা দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে চলেন, তাঁর ভাগ্যে একি বিড়ম্বনা? তিনি বলেন, এই অভাজনের ওপর কেন এত আক্রোশ? জেনে রেখো, তরবারির কসরৎ দেখাবার ফুরসৎ আমার জীবনে হবে না। তেগবাহাদুর কথাটা শুনতে বীরত্বব্যঞ্জক হলেও প্রকৃত অর্থ হল, দরিদ্রের অন্নদাতা, সেই পর্যন্ত আমি করতে পারি।

তাঁর রেসিগণেশন ধোপে টেকল না। গুরুপুত্র গুরু না হলে, দেশের হাল ধরবে কে? প্রলেতারিয়া-প্রভুত্বের থিয়োরী তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে দেশবাসী ভুল করেনি নির্বাচনে, শেষে অন্নদাতা হলেন অস্ত্রদাতা।

অল্প দিনেই মোগলের দরবারে তাঁর ডাক পড়ল। বুঝলেন দিল্লী নয়, যেতে হবে বৈতরণীর পারে। পিতৃদত্ত তরবারি তুলে দিলেন পুত্র গোবিন্দের হাতে—এই তরবারির সম্মান তোমার জাতির সম্মান।

তেগবাহাদুর গেলেন আওরাংজেবের দরবারে। সম্মানীয় অতিথির যোগ্য সমাদর করা হল। আদর-আপ্যায়নের মহোৎসব শুরু হল। আহা এমন বাদশার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করেছেন! শেষে বাদশা স্বয়ং হাতে হাত মিলিয়ে বলেন—আজ থেকে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরম আত্মীয়, আমাদের পরস্পরের প্রীতি-বন্ধন হবে চিরস্থায়ী। তবে এই বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে একটা অনুরোধ জানাব, আমরা হব ভাই ভাই—ধর্মে-কর্মে আমরা হব এক।

তেগবাহাদুর বলেন,—এ আপনার অশেষ উদারতা, কিন্তু সে অনুকম্পা গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার কই? আমি যে দীন সেবক, আমি যে শিখ!

—ও হো, আমার মনেই ছিল না সে কথা। তা বেশ, শুনেছি শিখদের ধর্মগুরু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, আমাদের সৌভাগ্য সেই অলৌকিক ক্ষমতা দেখার সুযোগ হল; বোঝাপড়াটা তাহলে ঘাতকের সামনেই হবে। তবে সামান্য অপরাধ করছি, কিছু মনে করবেন না, ঘাতকটি শিখ নয়, মুসলমান।

—তাতে অপরাধের কি? সে ত বন্ধু আওরাংজেবেরই দোসর? আরও একটা কথা, ধর্মগুরু যাদুকর এমন ধারণা থাকলে পরিবর্তন করে নেবেন; ভগবানের আরাধনা করা তার কাজ, মানুষকে সেবাধর্মে দীক্ষা দেওয়া

তার কর্তব্য। তবু বন্ধুর অনুরোধে এক খণ্ড মন্ত্রপূত পত্র রাখব আমার গলায়, ঘাতকের করণীয় শেষ হলে, দেখবেন সেখানি।

অবিশ্বাসী বাদশা নিতান্ত কৌতূহলবশে রক্তরঞ্জিত কাগজখানি তুলে দেখেন, তাতে লেখা আছে, 'শির দিয়া সর নে দিয়া'—মাথা দিলাম কিন্তু বিশ্বাস ত্যাগ করলাম না।

মোগলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর গুরুজীর আত্মদানের কথা, ছড়িয়ে পড়ল পান্‌জাবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। দলে দলে শিখ এগিয়ে এল প্রাণ দিয়ে ধর্ম রক্ষা করতে, গুরুজীর বাণী হল তাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা। তারা একবাক্যে প্রতিধ্বনি করে উঠল—শির দিয়া, সর নে দিয়া।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

অমৃতসরের অমর তীর্থ এখনও দেখা হয়নি, সেটি হল জালিয়ানওয়ালা-বাগ। এমন দু-চারটে তীর্থক্ষেত্র আর কিছু না করুক, নেতাদের বক্তৃতা দেবার সুযোগ বাড়িয়েছে। চিন্তাধারাকে ঘোরাবার জন্যে পেয়েছে চিরস্থায়ী সহায়। অবশ্য ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে আমরা নেই, পুস্তক-সন্ধানী সমাজকে সামান্য ঘায়েল করতে পারলেই সন্তুষ্ট, সবার অনুগ্রহে নব-সংস্করণের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হতে হলে সমর নায়ক-ডায়ারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব।

ডায়ারকে হাণ্টার কমিশন জিজ্ঞাসা করেছিল, সামান্যতম প্ররোচনায় অসংখ্য পুরুষ, শিশু ও নারীকে হত্যা করলেন?

ডায়ার মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—তেমন আর করতে পারলাম কই; অপদার্থ সেপাই, কাজ শুরু করতে না করতেই গোলাগুলি সব শেষ করে ফেলল।

ব্যাচারা ডায়ারকে সহানুভূতি জানাতে জানাতে বাগে এসে পড়লাম,

লম্বা সরু গলি, এর ভেতর দিয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেতে তিনি না জানি কত অসুবিধেয় পড়েছিলেন। যাই হোক এ বাগে আর বাঘ পড়ার ভয় নেই, এখন জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছেন সেই পুণ্যভূমি; শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে, তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখবে।

সেতুবন্ধনের সময় কাঠবেড়ালীকেও রামচন্দ্র সহানুভূতি জানিয়েছিলেন, আমাদের ক্যামেরাটা না হয় জাতিতত্ত্বে হরিজন, তাই বলে এত অশ্রদ্ধার পাত্র হবে বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝি বা দ্বিতীয় ডায়ারের সন্ধান পেলাম, আওয়াজ এল, খবরদার ফটো তুলবেন না। ভদ্রলোক বাঙালী এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের তত্ত্বাবধায়ক।

যে বস্তুটির ফটো তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল:

The ground was hallowed by the mingled blood of fifteen hundred innocent Hindus, Mussalmans and Sikhs who were martyred by British bullets on 13th April 19.9. The ground was acquired from owner by the public subscription.

বিচিত্র ফুলের টব দিয়ে জায়গাটা সাজান। কাছে আরও একটি বোর্ড আছে, তাতে লেখা: People were fired from here. এইখানে দাঁড়িয়ে ডায়ার যশের মুকুট পরেছেন।

মাঠটি বিরাট। তবে তা প্রাচীর-বিহীন ফাঁকা গড়ের মাঠ নয়, চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি দিয়ে ঘেরা, কেবল ডায়গনালি এগিয়ে গেলে অপর দিকে অনুরূপ প্রশস্ত একটি বহির্দ্বার। মাঝখানে আছে এক বড় ইঁদারা। ইতিহাসখ্যাত অনুষ্ঠানের দিন, এদিকে বসেছিল মহিলা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা; গুলি খেয়ে আরও কিছু খাবার আশায় ঝাঁপ দিয়েছিল এই কূপে। অন্ততঃ মৃত্যুকালে কেউ মুখে এক ফোঁটা জল পায়নি, এ অপবাদ ত দিতে পারবে না। আর দেখার মধ্যে আছে, পাঁচিলে সেদিনকার গুলির

দাগ। কাঠের ফ্রেম দিয়ে তার সীমানা নির্দেশ করা আছে, লেখা আছে 'গোলিকা নিশানা'।

পুরোনো কাসুন্দি ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কোন লোক যে বলে, পুরোনো হলে মজে ভাল; যত খাওয়া যায়, খাবার লোভ যায় বেড়ে। সেই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে একঘেঁয়ে কাহিনীর ধারা বিবরণী দিয়ে গেলাম, দোষ কিন্তু আমার নয়, ওই কাসুন্দি-ভক্তদের। কেউ সরাসরি আমার ওপর দোষারোপ করলেও বেনিফিট অফ ডাউটের ফাঁকে নিশ্চয় বেরিয়ে আসতে পারব।

* * *

প্রথম মহাযুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। ইংরাজ আমাদের মহাপ্রভু, তার বিপদের দিনে যে সাহায্য করব এতে আর আশ্চর্যের কি? তারপর যখন জানায়, তোমরা চাও স্বাধীনতা, আপনি বাঁচলে চাচার দিকে না চেয়ে কি পারি? আন্তরিকতায় বিগলিত হলেন ভারতীয় নেতারা, চলল সহযোগিতা দেখাবার প্রতিযোগিতা।

যুদ্ধজয়ের পর মিষ্টার মণ্টেগু জানালেন, মিটমাটের খসড়া তৈরী হচ্ছে, পরের দায়িত্ব বইতে আমাদের সাধ নেই। কমিটি গঠন করলেন জাষ্টিস রাওলাট, তিনি ত ন্যায়ধর্মের প্রতিমূর্তি, লণ্ডন হাইকোর্টের কিংস চেম্বার্স ডিভিশনের জজ। দরদী হিয়ার মহামূল্য রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ। মহাপ্রাণ না হলে কি কেউ সদাব্রত খুলতে পারে, তা কারাগারে হোক বা জাহান্নামে হোক।

ফলে এক পক্ষ দেখাল তর্জার লড়াই, অপর পক্ষ গোলাগুলির বড়াই। একজন বলে প্রতিবাদ জানাও, অসহযোগিতা কর, হরতাল চালাও; অপর পক্ষ বলে, রাজশক্তি কি ক্লীব হয়ে গেছে, লাঠিগুলোয় ঘুণ ধরেছে, অস্ত্রগুলো শুধু দর্শনধারী?

পয়লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে অমৃতসরে হয় বিরাট উৎসব। দলে

দলে আসে পল্লীবাসীরা, জমা হয় জালিয়ানওয়ালাবাগে—এ আবার শুধু উৎসব নয়, গায়ে দেশপ্রেমের রঙ চড়ান।

মংগলাচরণ তখনও শেষ হয়নি, উইংস-এর পাশে এসে হাজির হলেন নটরাজ জেনারাল ডায়ার। নিজের সম্প্রদায় ও সাজ-সজ্জা আনতে ভোলেন নি, এখনই যে শুরু হবে নাম-সংকীর্তন। অভিনব অভিনয় দেখার উত্তেজনায় দর্শকরাও শংকিত হয়ে ওঠে। খালি একটি ছোট্ট স্বর—ফায়ার! শব্দব্রহ্ম জেগে উঠল!

পবিত্র বাইবেলেই যে আছে—এট ফার্স্ট দেয়ার ওয়াজ ওয়ার্ড। অ্যাণ্ড ওয়ার্ড ওয়াজ গড।

লোকের ভীড় যেদিকে বেশী, ন্যায়দণ্ডের মুখ যেন স্বেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সেই দিকে ঘুরে অগ্নিবান বর্ষণ করে। ডায়ারের একটা দুঃখ থেকে গেল, প্রবেশের পথ যদি একটু বড় হত, কোন রকমে ঠেলে ঠুলে কামান যদি ভেতরে ঢোকান সম্ভব হত······অন্তত আক্ষেপ থাকত না জীবনে। তাহলে হাণ্টার কমিশনের সামনে নাকে কাঁদতে হত না—"আই থিংক, ইট ওয়াজ এ মারসিফুল থিংগ; আই থট, আই শুড শুট্ ওয়েল এণ্ড শুট্ ষ্ট্রংগ"। তাঁর বিচারের রায়ও তিনি পেশ করেছিলেন, একজন শ্বেতাংগের জীবনের বিনিময়ে এক হাজার ভারতীয়কে বলি দেওয়া হবে। সংখ্যাতত্ত্ব সে রায়কেও নাকি ছাড়িয়ে যায়।

এই প্রসংগে আরও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ইংরাজ ভদ্রমহিলা, মিস শেরউড ভারতীয়দের হাতে লাঞ্ছিত হন, অবশ্য পরে এক অধম কালা আদমিই তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্নে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু সেবার প্রতিদান দেবার সুবর্ণ সুযোগ ইংরাজ কোন কালে হারায় না। সেখানকার একশ পঞ্চাশ গজ পথ বেছে নেওয়া হয় পবিত্র স্মৃতি রক্ষাকল্পে। সে পথে চলতে গেলে একটু নতুনত্ব থাকবে, থ্রিল থাকবে অর্থাৎ বুকে হেঁটে যেতে হবে। এই রাস্তার দু-পাশে যাদের বাড়ী

তাদের ভাগ্য কত সুপ্রসন্ন। সব সময় ঘরে বসে এই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পায় আবার চাল-চিনি-আটা আনতে গেলেও নিজেদের তেমনি খেলা দেখাবার সুযোগ হয়।

লর্ড হাণ্টার বোকার মত প্রশ্ন তোলেন: স্থানীয় অধিবাসীদের বাইরে যেতে হলে কেন এই বিচিত্র পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করা হয়?

ডায়ার তাঁর অজ্ঞতা দেখে হেসে ওঠেন: আইন ত সব সময়ের জন্যে নয়, সকাল ছ-টা থেকে রাত দশটা; তারপর গেলে গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, সসম্মানে বুক ফুলিয়ে যেতে পারে। 'ইতি গজটা' আপনাদের অবগতির জন্যে জেনে রাখতে পারেন, রাত দশটা থেকে ভোর ছ-টা পর্যন্ত সেখানে বলবৎ ছিল সান্ধ্য আইন। রাস্তায় বেরোলে পয়সা লাগত না, বিনামূল্যে ভূরিভোজ করিয়ে দিত, কটা গুলি খেতে চাও।

মহাপ্রভুদের মর্জি হল, এখান দিয়ে যে যাবে সেলাম ঠুকতে হবে, তাও তাদের অভিপ্রেত কায়দা মাফিক। তথাস্তু। মন-মেজাজ ভাল নেই, ধরে আন যাকে পাও, চালাও বেত্রাঘাত। উকিলদের পাকড়াও কর, আইনের জঞ্জাল পরিষ্কার করে হাত পাকিয়েছে, এখন পথের জঞ্জাল সাফ করুক। এই সব উৎসব অনুষ্ঠান চলেছিল ছ-সপ্তাহ ধরে।

একদিন শিশু থেকে বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হল। শৃংখলা সহকারে লাইন দিয়ে দাঁড়াবার পর তাদের লজ্জাবরণের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা হল, মুখে থুতু দেওয়া হল, স্খলিত ভাষায় অভিনন্দন জানান হল; ভোজন দক্ষিণাস্বরূপ বেত্রাঘাতও জুটল।

আর কাগজ ভারী করে পাঠকের বিরক্ত-ভাজন হতে চাই না। ডায়ার বলেছিলেন, ওয়ান ইস্টু থাউসেণ্ড। চারজন ইংরাজের প্রাণহানি হয়েছিল, একজন আহত হয়েছিল; বিনিময়ে দরাজ ইংরাজ যা দান করেছিল, তাতে হতাহত হয় ৩,৮০০ জন; অকথ্য অত্যাচার হয় ৪,৫০০ জনের ওপর; বিব্রত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয় ৪৫,০০০ জন।

ইংরাজ বীরের জাত। বীরত্বের যোগ্য সম্মান দিতে সে কোন দিন কার্পণ্য করেনি, তাই বীরবর মাইকেল ডায়ার যখন দেশে ফিরে গেলেন, পেলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন, আর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ দেশবাসীর কাছ থেকে পান প্রায় দু-লক্ষ টাকা।

অক্ষয় হোক বীরপ্রসূ ইংরাজের বীরত্বের স্মৃতি পুরস্কার।

আমার ব্রেণে এতক্ষণে বোধহয় পচ ধরেছে, সেরিবেলামের ওপর সেডিমেণ্ট জমে গেছে, এই সমস্ত সিরিয়াস জিনিষ চিন্তা করতে হলে নিজের বুদ্ধির ওপর সংশয় জাগে, কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ি; এখন যদি কেউ একটা কোরামিণের বড়ী এনে দিত, অগত্যা একটা মর্ফিয়ার ছুঁচ ফুটিয়ে দিত, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম, মনে শান্তি হত।

কিন্তু আমার পেছনে সবাই মিলে শত্রুতা শুরু করেছে, কিছুতেই রেহাই দেবে না; এবার দেওয়ানী কোর্টের মামলা, জমি নিয়ে মারামারি। মাঠটার মালিক ছিলেন এক বস্ত্র ব্যবসায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধে বেশ দু-পয়সা করেছেন; যুদ্ধের শেষে তখন মন্দা বাজার, অর্থসংকটের আশংকায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সেই অবসরে তাঁর বাগটি রক্তরঞ্জিত হল, তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন, যত পবিত্র রক্ত আছে এখানে তার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবেন—মোটা দর হেঁকে বসলেন। ওই যে দেওয়ালটা দেখা যাচ্ছে, গুলির আঘাতে জীর্ণ হলেও আত্মমর্যদায় ওই বা কম যাবে কেন, উপযুক্ত দক্ষিণা ধরে দিতে হবে। মধ্যস্থ হলেন দেশ নেতারা, তুলাদণ্ড এক দিকেই গভীর ভাবে ঝুঁকে রইল, তবু একটা রফা হল। কংগ্রেসের প্রেসে সেই সম্ভ্রান্ত সভ্য মহোদয়ের ব্যাংকের খাতা ভারী হল আর দেশবাসী অর্থদণ্ড দিয়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের একটা উপসংহার আছে, কেন জানি না তা আজও ইতিহাসের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারেনি। সরকারী গেজেটে হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩,৮০০ জন; বহু বছর বাদে সে সংখ্যার

পরিবর্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৮০১। শেষ অভাজন প্রাণ দিয়েছে ফাঁসিকাঠে।

বৎসরান্তে দেশবরেণ্য নেতারা একবার করে জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে জ্বলন্ত বক্তৃতা দেন, উধম সিং সে ভারতীয় পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপদার্থ, তাই বোধহয় দেশ ছেড়ে ছুটলেন সুদূর বিলেতে। সেখানে ঘুরতে থাকেন ডায়ারের সন্ধানে, শেষে ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারপ্রান্তে গুলি চালিয়ে ডায়ারকে শাপমুক্ত করেন। আমাদের ভারতবর্ষ, গান্ধীজীর ভারতবর্ষ; তাই বোধহয়, উধম সিং ইতিহাসে আশ্রয় লাভ করার পক্ষে নিতান্ত অধম।

লাহোর

সকালে বেরোলাম লাহোরের পথে। কয়েক মাইল দূরে পেলাম বিরাট প্রাসাদতুল্য খালসা কলেজ। শুধু খালসা কলেজের দুর্নাম রটাব কেন, এই সব প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই ছাত্রের বহর যত থাক না থাক, বিদ্যানিকেতনের বাহার খুব। কলকাতার ছাত্র আমরা, হিংসা হয় বৈ কি? আড়াই কাঁচ্চা জায়গা নিয়ে আমাদের কলেজ কম্পাউণ্ড। সকালে মেয়েদের ক্লাস, দুপুরে ছেলেদের ন্যায্য অধিকার, রাত্রেও ফাঁক যায় না। আগে রাত-বিরেতে বাণিজ্য চলত, এখন কলা এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রও রাত্রের অংশীদার হয়েছে। ছোট ছোট খুপরি, তার মধ্যে ছাত্রদের দল পিল পিল করে অনুপ্রবেশ করে, যেন পিঁপড়ের সারি। তবু একদল ছেলেকে ভগবান সুমতি দিয়েছেন, ক্লাসের নিরস কথকথা তাদের ভাল লাগে না। সকল ছাত্র জ্ঞানপিপাসু হলে, অনেক কলেজকে গতায়ু হতে হত।

বন্ধু বলে—মিথ্যে কলেজগুলোর ওপর কালী ছড়ালে অন্যায় হবে। কলকাতায় এশিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিদ্যায়তনে বসে দর্শনের ভাষ্য শুনতে শুনতে কানে ঝংকার ধ্বনিত হয়—কেশরামের সতের নম্বর নরুণপাড়

ধুতি এক জোড়া, মনোমোহিনী-বনবালা শাড়ী দু-খানা···কই, তাড়াতাড়ি।

আমি জুড়ে দেই—এক বিদেশী পর্যটক গভীর ভাবে চিন্তা করার পর বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসনেস কোর্সের প্র্যাকটিকাল ট্রেণিং-এর ব্যবস্থাটা সত্যি প্রসংশনীয়।

*　　　*　　　*

অমৃতসর থেকে লাহোর মাত্র ২৭ মাইল পথ। সবটা না হলেও তার অর্ধেকটা ঘিরে আছে সহর। পথের দু-ধারে কারখানার সংখ্যাধিক্য দেখার পর ভাবা যায় না, এদেশে কাপড়ের বা পশমের জিনিষের অভাব হতে পারে। আর একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষও মিলতে পারে, অবশ্য তার নাম খোলাখুলি ভাবে বললে শ্রুতিমধুর হবে বলে মনে হয় না······আছে বিরাট বাটানগর—চরণাবরণের কলাকেন্দ্র। তার সর্বাংগে বিজ্ঞাপনের প্রলেপ, নগর-প্রাচীর ত নয় যেন চরণ-চিহ্নের নামাবলি।

ক্রমে লাহোর ষ্টেশন পেরিয়ে প্রবেশ করলাম সহরে। সহরটাকে সিটি আখ্যা দিলেও এর সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। উত্তর ভারতে কলকাতা আর দিল্লী বাদ দিলে সহরত্বে এর আসন সর্বাগ্রে।

সমাজিক মর্যাদায় সহর যত বড় হয়, আলোর দীপ্তির মত 'ইনভার্স স্কোয়ার ল' অনুসারে আশ্রয় লাভের সম্ভাবনাও তত কমতে থাকে। বড় বড় সহরে সহায়-সম্বল বলতে রামকৃষ্ণ মিশন-এর কথা আগে মনে পড়ে। আর যাই হোক, দক্ষিণেশ্বরের আপন-ভোলা লোকটি দেশের লোককে ভুলতে চায়নি। কিন্তু এখানে সেই ভোলানাথও রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সে ঘাটে তরী বাঁধতে অক্ষম হয়ে, গেলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমে। নাঃ, পরমপুরুষকে আজ আর পটান গেল না। বাঙালী এই সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে যদি কাজ হাসিল করা যায়, এই আশ্বাসে পরবর্তী অভিযান চালালাম বেংগলি ক্লাবে। তাস-বিকশিত-হস্তে, উগ্রনাসা বিস্তার করে তাঁরা জানালেন, হুঁ-উ-উ······সেক্রেটারি মশাই-এর আসার কোন ঠিক নেই।

সনাতন ধর্ম কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় বাঙালী, জানি না তিনি বাঙালী সংঘের একজন 'মালিক' কিনা? আমাদের পাঠান স্লিপ অবশ্য স্লিপ করে গেল না; সসিদ্ধ-নাড়ী নিয়ে, বড় রকম ধৈর্যের পরীক্ষা পাশ করে তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য হল। পরীক্ষার দ্বিতীয় অংক শুরু হল—কোন কলেজ, কোন বিষয়, কার বই, কোন প্রফেসার……?

শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ক জেরায় কাবু করতে না পেরে, ল্যাং মারলেন রেশনের শড়কি বাড়িয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম রাস্তায়।

আশ্রয়ের সন্ধানে আরও কত মাইল ঘুরতে হল, সে কথা চিন্তা করে দুঃখ না বাড়ানই ভাল। ঘড়ির দিকে ঘন ঘন দেখে, সহরবাসীকে কেন্দ্র করে মনের মলিনত্বকে ঘনীভূত করে কি লাভ? কব্জি-ঘড়িটা পুরে ফেললাম ঝোলার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কালীমাতার পদপ্রান্তে এসে হাজির হলাম। মন্দিরের প্রাংগণেই একটা চারপাই পাতা ছিল, হাংগামা পাকিয়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি না করে, নাক ডাকাবার তদবির করলাম। রাক্ষুসে ক্ষিদে আর কুম্ভকর্ণের ঘুম নিয়ে যেন আমাদের জীবন; পলক ফেলতে হল না, শোয়া মাত্র ঘুম, তখন শেয়ালে টেনে নিয়ে গেলেও কোন সাড়া মিলত না। পুরোহিত মশাই-এর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বিকেল বেলাও ছাড়িয়ে আসছে। সৌভাগ্যের কথা, রাত্রের অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়াতে হল না, কালীবাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে গেলাম।

লাহোর সহরের যে বর্ণনা সামান্য আগে দিয়েছি, তার সংগে এ পল্লীর কোন সামঞ্জস্য নেই। এ পল্লীটি যেমন নোংরা তেমনি কুৎসিত। চাকচিক্যের বিন্দুমাত্র নমুনা নেই বলেই বোধহয়, কানা-ছেলের-নাম-পদ্মলোচন এই পদ্ধতিতে নাম রাখা হয়েছে হীরামণ্ডি। এর সকল কলংক মুছে দিলেন কালীবাড়ীর পুরোহিত। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার ভুলিয়ে দিল সকল দুঃখ। লিখতে বসে দুঃখের সংগে একটি ছত্র যোগ করে দেই, স্বাধীনতা-উৎসব পালনের আহ্বায়কগণ যে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন,

তা সুদর্শন কি কুদর্শন বলতে পারি না, তবে নিরাশ্রয়ের সম্বল মানুষটি সে চক্রের আঘাতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিলেন।

*   *   *

পরদিন প্রথমেই গেলাম রণজিৎ সিংহ নির্মিত গুরদ্বোয়ারায়—বিরাট-সুসজ্জিত গুরদ্বোয়ারা, ঠিক তার পেছনেই বিখ্যাত বাদশাহী মসজিদ। দু-জনের সম্পর্ক ঠিক মুখোমুখি বলা যায় না বরং পিঠোপিঠি হিসেবে গণ্য করা যায়। হাতাহাতি করতে যাওয়া যাতে পরিশ্রম সাপেক্ষ না হয়, সেই জন্যেই কি এই প্রচেষ্টা?

শত্রুপক্ষের দেওয়া দুর্ভোগ সহ্য করেই দুর্গ—সে দুর্দশা থেকে লাহোর দুর্গ অব্যাহতি পেয়েছে; সে যে আপনা থেকেই সমাধি যাবার দিন গুনছে। যাত্রীরাও তার ভগ্নদশা দেখে যাত্রায় ভংগ দিয়েছেন। তবু ভাল, শুখনো সহানুভূতির শেল প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয় না। জনসাধারণ মুখ বন্ধ করেছে বলে আমাদেরও হাবা-গোবা সাজতে হবে, এমন কোন বিধান নেই। তবে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, যাত্রীরা তাকে যে পরিমাণ অবহেলা করে, ঠিক ততখানি তার প্রাপ্য নয়। আর এখানকার শিশ-মহলটা আগ্রা ও দিল্লী দুর্গের শিশ-মহল থেকে সুরক্ষিত। শিশ-মহল হল স্নানাগার, এখনও এর সর্বাংগে বিচিত্র দর্পণের বাহার; এ যেন সত্যি মায়া-মুকুরে মোড়া।

বিশ্বের সকল সৌন্দর্য থেকে তিল তিল অংশ নিয়ে ব্রম্হা গড়েন তিলোত্তমা; রূপসমুদ্র মন্থন করে উঠেছিল উর্বশী; স্বর্গের অমিয়-মাধুরী নিয়ে ডায়নার রূপসুষমা; বাদশাদের বেগমরা কি দেখতে তাদের মত ছিল? তাহলে সার্থক হয়েছিল এই বিলাসিতা।······জানি না, এই ধোঁয়াটে কল্পনা কোন গোলকধাঁধায় প্রবেশ করত, এক চামচিকে চমক লাগিয়ে কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল, দেখাল বর্তমান ও বাস্তব; জানাল, খবরদার আর এক পা এগিয়ো না।

মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিশার লালঝাণ্ডা দেশের মেয়েকে জীবন-সংগিনী করেছেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা ষ্ট্যালিন-প্রশস্তি গাইতে যান, এমন সংবাদ আজ পর্যন্ত মেলেনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইসমের লড়াই মেনে নিতে টিকিধারী সমাজবিদেরও বিশেষ আপত্তি থাকবে না; কিন্তু স্বামী মুসলমান আর স্ত্রী গ্রন্থসাহেব শুনতে গুরুদ্বোয়ারায় যান, এ ঘটনা আধুনিক সমাজের উদার মানুষের সুপ্ত সংস্কারেও মোচড় দেবে, সায় দিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। এখানে সে দৃষ্টান্ত পেলাম। নবাবের শিখ বেগমের উপাসনার জন্যে গড়া গুরুদ্বোয়ারা আজও বিরাজ করছে লাহোর দুর্গে।

দুর্গের মধ্যে মিউসিয়ামটি ঝাড়-পোঁছ করার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন যুগের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এর সর্বাংগ সুসজ্জিত। ঐতিহাসিক মূল্যমান দিয়ে বিচার করলে রণজিৎ সিংহের অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম-চর্মাদি এর শ্রেষ্ঠ সম্বল বলে অনুমান হয়।

ঠোঁটকাটা, কানকাটা, এমন কি নাক-কান-কাটা শব্দ বাংলাভাষায় আছে, ভাষা-সম্পদ-বৃদ্ধি-কল্পে আমি একটা নতুন শব্দের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি—তা হল আঙুলকাটা অর্থাৎ অপরাধী। মোগল আমলে পান থেকে চূণ খসলেই ছিল শাস্তি-বিধান, আবার তার জন্যে গর্দান নিলেও সংগত হয় না। ঠিক আছে, আঙুল থেকে কাটতে শুরু কর। দাগী আসামীর সন্ধানে আইবি ডিপার্টমেণ্ট তোলপাড় করতে হবে না, থাম্ব ইম্‌প্রেশনের সাহায্যে মশগুল হতে হবে না, আঙুল গুণলেই মিটে যাবে। ইকোয়ালিটি বিফোর ল সেদিনও ছিল, মহিলা বলে রেহাই পেত না। দুটি আঙুল কাটা যন্ত্র এখানে সুরক্ষিত আছে—বড়টি পুরুষদের শাস্তি বিধানের জন্য, ছোটটি অবলা-উদ্ধার-কল্পে।

* * *

বিকেলে বেরোলাম শালিমার উদ্যান পরিভ্রমণে। সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক নির্জন প্রান্তে এই উদ্যান। মোগলের বৈশিষ্ট্য এর

মজ্জায় মজ্জায়। এ সৌন্দর্য এবং স্বকীয়তায় ভরা। মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে স্বর্গ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তাই মাটির পৃথিবীতে তারা গড়ল স্বর্গোদ্যান, তা ধাপে ধাপে বিভক্ত। এই উদ্যানটি তিনতলা, চতুর্দিকে সুসজ্জিত ফুলবাগিচা; তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জলস্রোত, উচ্ছল ধারায় জলপ্রবাহ নেমে গেছে মধ্য দিয়ে। কারুকার্য করা শ্বেতপাথরের ওপর জলপ্রবাহের পথ, পাথরে আঘাত পেয়ে সে সৃষ্টি করে অনুপম সৌন্দর্য, কাশ্মীরী শালের সূক্ষ্ম শিল্পকেও এ হার মানায়, এই জলস্রোতের ওপর সেতু গড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সিংহাসন। নবাব তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে বিভোর হয়ে যেতেন এই সৌন্দর্য সুষমায়, জীবনকে ভরিয়ে তুলতেন রূপে-রসে-মদিরায়।

এই পুষ্পোদ্যান ও জলস্রোতের পরিকল্পনা অবশ্য ভারতের নিজস্ব নয়, এসেছে পারস্য দেশ থেকে। তাদের পার্বত্য পরিবেশ কাজে লাগিয়েছে জলপ্রবাহ সৃষ্টি করে। আর পুষ্পপ্রীতি তাদের আজন্ম সংস্কার, দুটি পয়সা পেলে একটি দিয়ে আগে ছোটে ফুল আনতে।

* * *

ইরাবতী নদী দিয়ে লাহোরের প্রান্ত ঘেরা। নদী পেরিয়েই জাহাংগীরের সমাধি-সৌধ। তার কাছেই আর একটা দীপ্তিহীন ভগ্নপ্রায় স্মৃতিসৌধ আছে। সৌধ ঠিক নয়, সে যেন বিষাদ ও অবজ্ঞার প্রতিমূর্তি। জগতের আলো, নুরজাহানের সমাধি নিয়ে এ গৌরবান্বিত।

খাস মহলের এই পরিচারিকা যৌবন আর রূপমদিরা দিয়ে একদিন সেলিমকে পাগল করেছিলেন। জাহাংগীরের মহিষী হয়ে শুধু প্রাসাদ আলো করলেন না, প্রতিভা দিয়ে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করলেন, দক্ষতা দেখালেন সাম্রাজ্য পরিচালনায়।

সামাজিক বিধিতে সে রূপসীর জলচল ছিল না বলেই ভাগ্য বাধ

সেধেছিলেন এই বিবাহে, সেই ভাগ্য তাঁকে শেষ জীবনে টেনে নিয়ে গেল পান্‌জাবের এক গণ্ডগ্রামে—দুঃখে-দৈন্যে কাটল শেষ দিনগুলো।

তাঁর পুঞ্জীভূত দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারেননি, তাই বলেছিলেন—আমার সমাধির ওপর তোমরা কেউ দিয়ো না ফুল, তাহলে সুন্দরের হবে অপমৃত্যু—জেল না কেউ সন্ধ্যাদীপ, এই অভাগীর জন্যে তাহলে অনর্থক পুড়ে মরবে কত মক্ষিকা!

কিন্তু সে অভিমানে কেউ সাড়া দিল না।

শুধু অভিমানের অশ্রুবন্যা নয়, কত শত অত্যাচারের অমর কাহিনী বকের মত লম্বা ঠোঁট বের করে মনে ঠোকর দেয় সামান্য সহানুভূতির আশায়: বালক হকিকৎ রায়ের ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ, একগুঁয়ের মত গুম্ হয়ে বসে রয়েছে; বলে জীবন দিতে পারি, বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারি না। যুবরাজ নউনেহাল সিং নিজের হাতীর পায়ের তলায় পড়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা অবস্থায় বলছে, উৎসবের তোরণদ্বার ভেঙে পড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, এ নিশ্চয় ষড়যন্ত্র। সেলিমের সাত শত সমর্থক, বন্দী অবস্থায় রয়েছে ইরাবতীর তীরে। যোধবাই-এর চোখের জল, আকবরের অপত্য-স্নেহ বিদ্রোহী সেলিমের ক্ষমাভিক্ষা পাবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আইন-ই-আকবরের কোন ধারা সে অনুচরদের রক্ষা করতে পারল না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অত্যাচার সম্বল করেই তারা প্রাণ হারাল।

স্বভাব চাপল্য নিয়ে সাড়া দেয় আর একটি কুসুমকলি, যেন রজনী-গন্ধার ঝরা পাঁপড়ি, সেতারের মৃদু ঝংকার, বেহাগ রাগিনীর ক্ষীণ বিলম্বিত আলাপন। সে যে ভালবেসেছে, আকাশের মত স্বচ্ছ-বিস্তৃত তার ভালবাসা—হাসনাহেনা ফুলের মত, কমলদলে ভরা তরংগায়িত দীঘির মত। সেখানে জমা হল কালো মেঘ, উঠল তীব্র ঝড়, ফণা উঁচিয়ে এল বিষধর, ভালবাসতে গেলেও নো অব্‌জেকশন সার্টিফিকেট লাগে; আইনের স্বীকৃতি লাগে!

আনারকলি! ডালিমের ফুল—সুন্দর-সুরভিত! তার স্মৃতিসৌধে লেখা আছে ঃ

তা কয়ামৎ সুকর্ গোয়াম কির্দ গারই খায়েশ রা
আগার মান বাজ বীনাম রুয়ে ইয়ারী খাযেশ রা
মজনুন্ সেলিম-ই-আকবর।

আহা! যদি আমার দয়িতার মুখখানি আর একবার দেখতে পেতাম,
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতাম।
আকবরের প্রেমাতুর পুত্র সেলিম।

নাম তার নাদিরা। সে শুধু রূপে উর্বশী নয়, নৃত্যে ইন্দ্রসভার মেনকা, সংগীতের সময় কণ্ঠে ঝরে সুরসুধা। আকবর মুগ্ধ হলেন প্রতিভায়, আরও বিস্মিত হলেন যখন শুনলেন, এ সংগীত তার নয়, এ প্রেমের পুরস্কার—সে নিজে গান গায় না, প্রেম তাকে সংগীত-মুখর করে; কারও আদেশে সে নাচে না, প্রেম এনে দেয় নৃত্যের সুললিত ছন্দ। সেই সুর ও ছন্দ তার সিপাইয়াকে ঠিক টেনে আনবে কাছে। কত গভীর তাদের ভালবাসা, কত নিবিড় তাদের প্রেম। আকবর স্তব্ধ-বিস্মিত-বিমোহিত; বর্ণে বর্ণে সত্য তার উক্তি। বাদশা বলেন, তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছ; বল কি তোমার প্রার্থনা, কত মহামূল্য সম্পদ পেলে তুমি সুখী হবে?

সে শ্রদ্ধায় প্রণাম জানায় বাদশাকে, বলে আর কিছু নয়, কেবল আপনার হাতের ওই এক গুচ্ছ আনারকলি। সেই দিন থেকে নাদিরা হল আনার।

এই আনার, ইরাণের রাণী নয়, সাধারণ ব্যবসায়ীর মেয়ে। ব্যবসায়ে দণ্ড দিয়ে তিনি ভাগ্য ফেরাতে সপরিবারে যাত্রা করেন ভারতের উদ্দেশ্যে। পথে ভাগ্য ফিরল দস্যুদের, লাভ করল রূপসাগরের রাণীকে। এ হেন সময় বাদ সাধলেন সেনাপতি মানসিংহ। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এ অমূল্য রত্ন নিয়ে কি কাজে লাগাবেন? পাঠিয়ে দেন আকবরের দরবারে। এদিকে মানসিংহের সৈন্যবাহিনীতে ছিল সেলিম, আনারকলির রূপ-সাগরে তার হল

ভরাডুবি, সিপাইয়া সেজে করল অভিমানিনীর মন হরণ। প্রেমে দু-জনে পাগল, এ নশ্বর বিশ্বে তারা কিছু চায় না, এই প্রেমের স্বপ্নসুধা পান করে জীবনকে ধন্য করবে, সার্থক করবে।

কিন্তু একজন যুবরাজ, দু-দিন বাদে সে হবে দিল্লীশ্বর, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। অপরজন ঘৃণ্য কানিজ, রূপলাবণ্য ও সুললিত কণ্ঠের বিনিময়ে মিলেছে আশ্রয়—তার শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি।

আনারকলির প্রেমের স্বর্ণসৌধ হঠাৎ জৌলুষ হারিয়ে ফেলল, সে দেখল, এ যে গিল্‌টি করা। সিপাইয়া তাকে ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে—এ তার প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয়—ভালবাসেনি এক বিন্দু, করেছে উপহাস! বুঝল তার প্রেমের ঘটেছে অপমৃত্যু। সিপাইয়া বলে কেউ ত নেই, এ যে স্বয়ং যুবরাজ, ভাবী কালের শাহানশা বাদশা। বাদশার সাথে নর্তকীর প্রেম, সমুদ্রের সাথে শেওলার ভালবাসা, অনন্ত আকাশের প্রতি একখণ্ড মেঘের আকর্ষণ! আনারকলি প্রেমের অপমান সইবে না। চলে যাবে এ দেশ ছেড়ে; দূরে, বহু দূরে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, ভূলোক-দ্যুলোক ছাড়িয়ে।

বাধা দেয় সিপাইয়া, প্রয়োজন হলে তার বুক চিরে দেখাতে পারে, সেখানে লেখা আছে আনার, সে যে তার প্রেমের প্রতিমা, তার জীবন-সর্বস্ব। যদি চলেই যায়, শুধু হাতে নয় তার জীবন-দেবতাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাক—আনারশূন্য জীবন তার কাছে মৃত্যুর বাড়া।

আবার নূতন সুরে বাঁধে বীণাখানি, তার মূর্চ্ছনায় যেন নবীন আনন্দ; তীব্র আবেগ তাদের ভালবাসায়; ভালবাসার মদিরায় পাগল করা তাদের জীবন—সে যেন কানায় কানায় ভরা।

রাজধর্ম সর্বক্ষেত্রে বজ্র-সুকঠিন কিনা বলা যায় না, তবে এ ভালবাসাকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখল না—আভিজাত্যের অভিমানে ভালবাসার কোন

মর্যাদা নেই। হিন্দুস্থানের মসনদ প্রতিবাদ করল, এ ভালবাসা পাপ; সমাজ দিল ধমক; শাস্ত্র জানাল অসম্মত।

আকবর জানলেন সব। এ বেয়াদপি তিনি সইবেন না। শৃংখলাবদ্ধ হয়ে আনার গেল কারাগৃহে। সেলিমের সকল মিনতি ব্যর্থ হল, যোধবাই-এর মাতৃত্বের কোমলবৃত্তিতে খোঁচা দিয়েও কাজ এগোল না, মামা মানসিংহেরও মন গলল না কণামাত্র। শেষে কারাগারের রক্ষী অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দিল আনারকে।

উত্তেজনার মুখে সেলিমের বিদ্রোহ করাই সার হল; বোকা সাজিয়ে তাদের বন্দী করলেন আকবর। রাজবংশের একমাত্র সন্তান হিসেবে সেলিম পেল ক্ষমা ভিক্ষা, ওদিকে আনারের হল জীবন্ত সমাধি।

সেলিম মুক্তি পেয়ে ছুটে গেল সমাধি ক্ষেত্রে, চির পরিচিত নাম ধরে কতবার তাকে ডাকল, কত মিনতি জানাল, তবু সাড়া পেল না……অভিমানিনী সিপাইয়া বলে আর কোন দিন কি ডাকবে না!

* * *

লাহোরি গেট ছাড়িয়েই আজও রয়েছে আনারকলি বাজার, লাহোরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাজার। সহরের অভিজাত সম্প্রদায় থাকেন এই পল্লীতে—এ সুন্দর এবং সুসজ্জিত। তার স্মৃতিস্তম্ভও সযত্নরক্ষিত।

সেলিম ছিলেন প্রেমে পাগল। তবে কতবার কত জনকে দেখে তাঁর সে বৃত্তি সজাগ হয়ে উঠেছিল, সে সংখ্যাতত্ত্ব কোথাও লেখা নেই। ইতিহাস আর জনশ্রুতি মিলিয়ে দু-জনই উত্তর কালে প্রাধান্য লাভ করেছে কিন্তু সহজ ভাবে জীবনসাথী হিসেবে তাদের কাউকেই পাননি। মাঝে বংশমর্যাদার খানা কেটে আকবর বাদ সেধেছেন উভয় ক্ষেত্রে। তাদের একজনের হল জীবন্ত সমাধি, অপরজন হল পরের ঘরণী।

সেলিম সম্রাট জাহাংগীর হয়ে ভোলেননি কাউকে। তাই গড়লেন আনারের স্মৃতিস্তম্ভ, লোকে নতুন করে জানল সে প্রেমের কাহিনী। আর

মেহের-উন্নিসাকে সশরীরে প্রবেশ করতে হল তাঁর হারেমে। মহিষী রূপে হলেন নুরমহল—প্রাসাদ আলোকিত হল তাঁর রূপে; ক্রমে প্রতিভায় ও আত্মশক্তিতে হলেন নুরজাহান—ইতিহাসের পাতা ভরে উঠল তাঁর জয়গানে।

ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া কি বলা যায়? নুরজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ ভগ্নদশায় পড়ে রইল সহরের বাইরে, তাঁর নামে ইতিহাসের পাতায় রইল সামান্য আঁচড়; তিনি রইলেন লোকের মনের এক বিস্মৃতপ্রায় কোণে। অপর দিকে আনারকলি, কি তার পরিচয়? ইতিহাস করল অবহেলা, অবজ্ঞাভরে নামটুকু উল্লেখ করল না, হারেমের নগণ্য বিদ্রোহী বাঁদী বলে তাকে মুছে ফেলতে চাইল মানুষের মন থেকে, অথচ আজও সে বেঁচে আছে লাহোরের ঘরে ঘরে, প্রতিটি লোকের মুখে—সে যে প্রেমের প্রতিমা।

গুজরাটের পথে

অনেক দিন লাহোরে কাটালাম, কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ কয়েক ঘণ্টা বাদে হয়ত এ চিন্তা মনেই আসবে না, মানুষের মন সত্যি বিচিত্র। সমগ্র হিন্দুর পান্‌জাব অতিক্রম করে রাজধানী লাহোর ছাড়িয়ে এলাম, এবার মুসলিম পান্‌জাব।

এতদিনে ধারণা হয়েছে পান্‌জাব গরীবের দেশ নয়, তার আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। বিশেষতঃ যুদ্ধের দৌলতে আরও ফেঁপে ফুলে উঠেছে। তাই এদের পেটে বোমা মেরে আবরণে চাকচিক্য বজায় রাখতে হয় না; এবং দু দিক দিয়েই তারা লোকের চোখে ধাঁধা লাগাবার চেষ্টায় আছে। লোকের বিত্ত হিসেবে পোষাকে তুলনামূলক পার্থক্য বড় একটা দেখা যায় না; গাঁয়ে হোক, সহরে হোক, সবার পোষাকে আমীরী আঁচ না থাকলেও উজীর বা কোটালের ধাঁচ পাবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কথায় বার্তায় ফিরে এলাম লাহোর, বলি—লাহোর সহরটি চমৎকার,

ঝক-ঝকে তক-তকে, পথের দু-পাশে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তার থেকেও দেখতে ভাল সহরের মানুষ—সুন্দর, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। সংস্কারের বালাই নেই, ছোঁয়াছুঁইর বাতিক নেই, কেমন সপ্রতিভ কেমন স্বাধীন।

বিশেষ বয়েসের ধর্মে বিশেষ বয়েসের নারী দেখলে মনে হয়, সবাই বুঝি তিলোত্তমা-মেনকা-উর্বশী। জানি না বয়োধর্মের কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা, তবু এই পোড়া চোখে বিচার করে বলতে পারি, এখানকার মেয়েরা সুন্দর। টানা টানা চোখ, বাঁশীর মত নাক, দুধে আলতা গায়ের রঙ, আপেলের মত গাল, তাদের স্বাস্থ্য গর্বের বিষয়। যদি কিছু অভাব থাকে তা পূরণ করেছে তাদের স্মার্টনেস, পথে-ঘাটে তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি, তাদের সংস্কারমুক্ত মন। কাশ্মীর রমণীর রূপ হল উপকথার উপাখ্যান, এরা বাস্তবে তাদের অনেকখানি পেছনে ফেলেছে আর প্রগতির পথেও বাংলাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আগে ধারণা ছিল, বাংলাদেশের নারীই বোধহয় প্রগতির অগ্রদূত। একদিন হয়ত সেকথা সত্যি ছিল, তবে আজ নারী-স্বাধীনতায় পান্জাব অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বন্ধু যেন ক্ষেপে ওঠে, বলে—প্রগতি! গতি যদি তার মাপকাঠি হয়, সে কথা বলতে পার। স্বাভাবিকতা ছেড়ে পান্জাব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, সে আলোর অসীম গতি নিয়ে হয়েছে রঞ্জনরশ্মি—আলট্রা ভায়োলেট রিজিয়নে তার অবস্থিতি। এরা এক্স্-রে ওয়াই-রেকেও ছাড়িয়ে চলেছে। তার পরই কিন্তু হিট ওয়েভ। সেই আগুনে না ধ্বংস হয়ে যায়।

—আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনাও ত হতে পারে।

—হতে পারত, যদি তা হত শিক্ষার আগুন, এ শুধু বিলাসিতায় ভরা, এরা শ্লীলতাকেও যে হারাতে বসেছে।

—ওসব বাজে কথা, অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট, ও আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করা না করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে যুক্তি দিয়ে বলা যায়, ভারতের মধ্যে সর্ব প্রথম ইংরাজের সংস্পর্শে এসেছে বাঙালী। সুযোগের কিছু অপব্যবহার হলেও তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রাস করেছে; বাঙালী অনুকরণ করেছে সত্যি, তবে আদর্শকে একেবারে হারায়নি। ভোগের সম্ভার নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল না, খুঁজেছে জ্ঞানের আকর। তাই বাঙালী করেছে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি, রূপ দিয়েছে অনুপম শিল্পকলার, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে নিজের আসন করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। সবার বড় কথা তারা দেশবাসীর কানে দিয়েছে স্বাদেশিকতার মন্ত্র, ভারতকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ, সর্বক্ষেত্রে করেছে নেতৃত্ব।

সবার শেষে পাশ্চাত্যেব সংস্পর্শে এসেছে পান্‌জাব। বাংলা অধিকারের প্রায় একশ বছর পরে লর্ড ডালহাউসির কৃপায় পান্‌জাব ইংরাজের করতলগত হয়। অথচ তারা আজ প্রগতির অগ্রদূত। আসলে রাতারাতি পাশ্চাত্য সভ্যতা গিলতে গিয়ে তাদের বদহজম হয়েছে।

প্রকৃতি তাদের স্বাস্থ্যের সাথে মগজখানাও গজ দিয়ে মেপে ব্যবস্থা করেছে, সূক্ষ্মতার অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। ঘুসির জোরেই সবাইকে ঠাণ্ডা করেছে, কূটনীতি ও সমরকুশলতার ধার ধারতে যাবে কোন অপরাধে? ইংরাজ দেখল, ওদের বীরত্ব আছে, স্বাদেশিকতার প্রতিষেধক ভ্যাকসিন সৃষ্টি কর। পরমার্থরূপী অর্থ দিয়ে লাগাও কড়া ডোসের ইনকুলেশন, ওরাই রক্ষা করবে ইংরেজের সাম্রাজ্যকে।

ইংরাজ তাদের শিক্ষা দেয়নি, দিয়েছে অর্থ আর জুগিয়েছে বিলাসিতার উপকরণ। তাই প্রগতির আবরণে হয়েছে অধোগতি, নারী-স্বাধীনতার নামে লাভ করেছে অসংযম। গতিতে ওরা সত্যি হাই স্পীড রকেট, ঠেলে দাও জিন-রামের প্রতিযোগিতায়, কৌন কনটেষ্ট করবে, নির্ভুল ষ্টেপিং ফেলে নেচে যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বলি—মিস্ মেওর নাম শুনেছিস—দরদী পর্যটক। গান্ধীজী যাঁকে

যড় পোস্ট নিবেদন করেছিলেন—ড্রেন ইন্‌সপেক্টর। সত্যেন দত্ত মেথরকে আলিংগন করতে বলেছেন কিন্তু তাদের ইন্‌সপেক্টরদের নয়।

কানু বলে—অভিযোগ যুক্তি নয়। ওদের সব থেকে বড আ্যাচিভ্‌মেণ্ট ত সৈন্যদলে ক্যাপ্টেন বা মেজর হওয়া। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় লালা লজপৎ রায়।

—লোকে চশমা পরে দৃষ্টিকে সংশোধিত করার জন্যে। আবার রঙীন কাঁচে দেখতে পায় বিধর্মী রূপ, অপটিকাল ইলিউশনের ফলে দেখে বিকৃত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে পান্‌জাবের দান বড কম নয়। গদব পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক হরদয়াল, দেশে-বিদেশে সম্মানীয় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, ভাই পরমানন্দ, বরকতুল্লা, পান্‌জাবের এই মহাপুরুষরা সকল ভারতবাসীর প্রাতঃস্মরণীয। লাহোর যড়যন্ত্রে বহু বিপ্লবী মায়ের পায়ে জীবন উৎসর্গ করেছে। বজবজের কোমাগাটামারু, অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ, অনন্ত কাল ধরে সাক্ষ্য দেবে ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে পান্‌জাবের দান।

আরও বলি—এদের মধ্যে জন্মলাভ করেছেন, পান্‌জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ—যাঁর প্রতিভা ভারতের গর্বের বিষয। ভেবে দেখ্, সহায়-সম্বলহীন নাবালক, এক ক্ষুদ্র মিশল তার অধিকারে আর অসংখ্য শক্তিশালী শত্রু মাথা তুলেছে চতুর্দিকে। তবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন, শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেছেন, পান্‌জাবে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। ইংরেজ সমগ্র ভারতকে পদানত করেছে কিন্তু পান্‌জাব-কেশরীর কেশ স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ তিনি কেবল সাথে করে এনেছিলেন পিতৃদত্ত কুৎসিত খর্বকায় আকৃতি, ভাগ্যগুণে হলেন এক চক্ষু, সামান্য লেখাপড়া শেখার সুযোগও মেলেনি জীবনে। কত বড় প্রতিভার অধিকারী হলে, কোন লোক এই অবস্থায় মানুষ হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে।

—সেই মহাপুরুষ রণজিৎ সিংহ ছিলেন পরম চরিত্রবান, সাকী আর

সুরা ছিল তাঁর অন্তরংগ সাথী। এই সব শুভ কাজে কোন দিন তাঁর মাত্রা-জ্ঞান থাকত না, অতিরিক্ত মৃতসঞ্জীবনী পানই তাঁর মৃত্যুর কারণ; অবশ্য সেজন্যে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ ছিল না। ইতিহাস বলে, তাঁর মাও ছিলেন সাধ্বী ও চরিত্রবতী। শাশুড়ী সুদাকৌড় যিনি এককালে ছিলেন রণজিৎ-এর প্রটেক্টার-কাম-চীফ-অফ-এড্ভাইসরী-কাউন্সিল; জামাতার আনন্দ-বর্ধনের আশায় নিত্য নূতন অন্বেষণ করতেন। যদি মেয়ের সতীনের ছেলে রাজমুকুট পরে, উৎকণ্ঠায় ব্যতিব্যস্ত হন; সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায়, তিনি দাসীপুত্র এনে নিজের কন্যার সন্তান বলে প্রচার করেন।

—সেই কারণেই ত বলি, রণজিৎ সিংহ প্রতিভাবান, এত বিপরীত পরিবেশের মধ্যেও যিনি প্রতিপত্তিশালী হয়েছেন, তিনি সত্যি কৃতী-পুরুষ।

* * *

বেলা দুপুর তখনও হয়নি, বাহন ছেড়ে নেমে পড়লাম খাবারের সন্ধানে। এক 'প্রাজী'র দোকানে প্রবেশ করলাম। লোকে শুনতে বাসনা জানাক বা নাই জানাক, পরিচয়টা শুনিয়ে দেই, বলা যায় না কিছু, যদি ভাগ্য ফেরে; না হয় সামান্য শুখনো খাতির ত মিলতে পারে? এযে কেমন কেমন মনে হয়, বোধহয় ওষুধ ধরেছে। জিজ্ঞাসা করে—আপনি বাঙালী?

বাঙালীরা আবার কবে ওর পাকা ধানে মই দিল, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতিশোধ তুলবে নাকি? বরাতে যা আছে রোধ করবে কে? মৃদু হেসে বলি, আজ্ঞে হাঁ এ অভাজনরা বাঙালী।

তাঁকে যেন আরও একটু উৎসাহিত দেখায়, বলেন—কলকাতার খবর কি? গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এ কি সত্যি বিভৎস ঘটনা ঘটেছে?

শেষে আমাদের ওপর কোপ পড়বে নাকি? না-না, দাড়ি রয়েছে, ঝুঁটি

রয়েছে, মুসলমান ত নয় ; ভয় কি ? কিন্তু যদি আমাদের মুসলমান বলে ঠাওর করে ?

আমাদের কথাবার্তাগুলোও আজ কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, এমন একটা ফাঁক খুঁজে বের করতে পারছি না, যার মধ্যে ঢুকিয়ে দেই, আমরা হিন্দু এই কথাটা। এবার একেবারে কড়া বাঁধনে বেঁধে ফেলল ; বলল, যদি আপত্তি না থাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা আমার এখানে……।

মানসিক বৃত্তিতে নিশ্চয় এখন মেকানিকাল হয়ে গেছি, বলে ফেলি সে ত আনন্দের কথা। পর মুহূর্তে শিউরে উঠি, এ কি করলাম! এ যে আত্মহত্যা! কোন অজুহাত দেখিয়ে এখনও ফেরা যায়। ফিরে যাব? কিন্তু যাব যাব ভাবতেই এত দেরী হয়ে গেল, ফিরে যাব বলতেও চক্ষুলজ্জায় বাধল। আর যদি তেমন কিছু মতলব তার থাকে, রোধ করবে কে ?

কিছুদূরেই ভদ্রলোকের বাড়ী। বসলাম তার বৈঠকখানায়, গিলোটিনে যাবার আগে মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ যেমন বসে। অবশ্য বাইরে ঘর দেখেও ত খুনী খুনী বলে মনে হয় না। ওসব ভেবে কি লাভ ? নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

কি জানি কতক্ষণ সময় কেটেছে, ক ঘণ্টা বা ক প্রহর। এক ভদ্রমহিলা আসছেন তু-কাপ চা নিয়ে। চায়ের মধ্যে বিষ মিশিয়েই কাজ হাসিল করবে, খাবার তৈরীর খরচটাও অপব্যয় করবে না, যথা ইচ্ছা। কিন্তু মেয়েদের মন ত কোমল হয়, দরবার জানাব ? তিনি অনন্তকালের ম্যাডোনা, এই বলে মিনতি জানালে কেমন হয় ? কিছুই আর করা হল না, কেবল মাতৃভাষায় স্বগতোক্তি করি, এত বেলায় আবার চা ?

—কেন, চায়ে অরুচি হল নাকি ?

ফাঁসি নয় ফাঁসির বাড়া, এ যে একেবারে বিশুদ্ধ বাংলা! ঠিক শুনেছি ত! নাঃ, আমার মাথার বোধহয় কোন গণ্ডগোল হয়ে থাকবে,

নিজের ওপর কেমন যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তিনিই আবার বলেন—কি অবাক হয়ে যাচ্ছেন ?

এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, সকল রহস্যের সমাধান হল। সুদূর পান্‌জাবের এক পল্লীতে বিদেশীর ঘর আলো করে বাঙালী বধূকে দেখতে পাব, এ কল্পনার অতীত। সামলে নিতে একটু সময় লাগবে বৈকি ? তবে বলি—বাক্য আমাদের খুবই সরে। ঘর ছেড়ে এতদূর আসতে পায়ের চেয়ে শ্রীমুখকে শক্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছে অনেক বেশী। বলেন ত এক গোছা টেষ্টিমোনিয়াল দেখাতে পারি ?

—দেখে আনন্দিত হলাম আমার ভাইরা বোবা নয়।

—আমাদের কিন্তু আনন্দের লেশ নেই মনে। সব মাটি হয়ে গেল। কোথায় ঘুরে ঘুরে এক হট্টমন্দিরে যাব, পালোয়ানী চালে কসরৎ করে শুকনো রুটি ছিঁড়ব ; তা আর হল না, ঘর ছেড়েও খেতে হবে দিদির হাতের স্নেহভরা খাদ্য।

—মোটমাট বোঝা যাচ্ছে খাবারটাই প্রধান, দিদি কেউ নয় ?

—অপরাধ স্বীকার করছি। বন্ধুর মনের কথা বলতে পারিনে, তবে আমার মত ভোজনসর্বস্ব লোকের এই হল প্রাণের কথা। কিন্তু কবিগুরু তাঁর ভাষা-সম্পদ দিয়ে আমায় রক্ষা করে গেছেন ; তিনি বলেছেন, তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ—আপনার স্থান তাহলে অনেক উর্ধে।

—হায়, কয়েক মুহূর্ত আগে ভেবেছিলাম তোমরা বোবা !

—সে আপনার অশেষ করুণা !

এমন সময় দিদির স্বামী এসে হাজির হলেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা শুরু করেন। জানান, কি আসতে না আসতেই ভাইদের সংগে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, তেতে পুড়ে এলেন আপনারা, কোথায় দুটো মিষ্টি কথা শোনাবে ?

যোগ করে দেই—সত্যি, আপনিই বলুন, কি অন্যায়! আবার হয়ত প্রত্যুত্তরে এও শুনতে পাবেন, ভাইরা চিরকাল বোনকে দেখতে পারে না, মিথ্যে মিথ্যে কথার আঁকশি বাড়িয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করা ওদের স্বভাব।

তিনি বলেন—আমার আদেশ, এ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমি বললাম—নিশ্চয়, আলবাৎ করতে হবে।

—সবাই যখন অধর্মের পক্ষ নিল, হার স্বীকার করতে বাধ্য, আধুনিক ধর্মযুদ্ধে কুরুকুলের জয় সুনিশ্চিত। যাই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করি।

* * *

দিদি চলে গেলে ভদ্রলোক বলেন—প্রথম প্রথম মিনতির খুব কষ্ট হত। বাংলা ছেড়ে পান্‌জাব, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। কিন্তু ওর সহ্য শক্তি অশেষ। এক দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কষ্টের কথা স্বীকার করেনি, কোন অভিযোগ জানায়নি; এখন অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর কথা মনে হলেই কেমন যেন মায়া লাগে। বাপমায়ের স্নেহ-ভালবাসা কি, সে আস্বাদ জীবনে পায়নি; অযত্নে পাঁচজনের অবহেলায় এবং অনুকম্পায় হয়েছে মানুষ; দ্বিতীয় দফায় মেনে নিতে হল এই পরিবর্তন। লেখাপড়া বেশ শিখেছে, বাংলাভাষার ওপর যেন ওর প্রাণের টান। কত বই আনিয়ে আলমারি ভরিয়েছে। তবে প্রবাসী বাঙালী-সমাজের ওপরই ও সব থেকে বিরূপ। স্নেহের কাঙাল হয়ে মানুষ যেখানে যায়, যদি পায় অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ, বলুন মনের অবস্থা কি দাঁড়ায়? তার অভিমান হওয়া কি অসংগত? এখানে অবশ্য সে-সব বালাই নেই, বাঙালী কাউকে এ তল্লাটে পাবেন না। পূজাপার্বনে বাঙালীদের সংগে মিশবার সুযোগ মেলে, কিন্তু ওমুখো সে যেতে চায় না বরং এড়িয়ে চলে তাদের। দুর্গাপূজায় সহরে যায়, মায়ের পায়ে প্রণাম জানায়, তবে পরিচয় জানায় না কখনও। দেখতে ভালই, স্বাস্থ্যও ভাল, পান্‌জাবী বলে মানিয়ে যায়।

ভাবছিলাম, স্নেহ-সান্ত্বনা এইসব অপদার্থ বৃত্তিগুলো মানুষ তাদের

জীবনদর্শন থেকে বাতিল করেছে; বরং কুকথায় পঞ্চমুখ হতে তার লালসা; মানুষকে আঘাত দিয়ে, অবমাননা করেই তার তৃপ্তি, তার আত্মোপলব্ধি। স্নেহের কাঙাল হয়ে যে ঘুরে ঘুরে বেড়াল, পেল শ্লেষ, উপহাস আর অবজ্ঞা। অনাথ-আশ্রমে তিনি মানুষ হয়েছেন, সমাজ ছিল অপরিচিত। যৌবনে যখন তাকে আপন করে নিতে চাইলেন, দেখলেন সেখানে তাঁর মাথা গলাবার ঠাঁই নেই। হয়ত তাঁর গুণ ছিল সাধারণের থেকে বেশী, কিন্তু পারাণীর মোটা কড়ি জুটবে কোথা থেকে? তাই আজন্ম চেনা দেশঘর ছেড়ে এক নতুন অপরিচিত সমাজের আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে হল। তবু ভরিল না চিত্ত। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে আজও তাঁকে অযথা উপহাস করি।

আরও জানলাম, ভদ্রলোক কলকাতায় ছিলেন অনেক দিন, তখনই বিয়ের যোগাযোগ হয়; মিনতিকে বিয়ে করার পরও বছরখানেক সেখানে ছিলেন। সংসারের একমাত্র সন্তান, তাই বাবার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশে যখন ছিলেন, সে দেশের ভাষায় তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, অথচ সুদূর পান্‌জাবে বসে আজ তিনি মোটামুটি বাংলা বলতে পারেন, পড়তে পারেন। তবু আক্ষেপ করে বলেন—মিনতি যখন পান্‌জাবী ভাষায় কথা বলে, কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারে না একজন অপান্‌জাবীর কথা বলে, অথচ আমার বাংলা ভাষাতত্ত্বে হরিজনের স্তরেও উঠতে পারল না।

উত্তরে বলেছিলাম—শেখাটা নির্ভর করে প্রাণের টান ও প্রয়োজনের তাগিদে, আপনার দুটোরই অভাব, ভাল করে শিখবেন কোথা থেকে? এমন সময় দিদি এসে পড়েন, ভর্ৎসনা শুরু করেন, শুধু গল্প করলেই পেট ভরবে, নাওয়া-খাওয়ার প্রয়োজন নেই?

—পেটুক প্রবরদের ওসব কথা বলে কেন মিছে লজ্জা পাচ্ছেন?

—বুঝেছি, আমার গুণধর ভাইদের অশেষ গুণ, এক-একটি কথার

জাহাজ, এখন অনুগ্রহ করে ভোজনপর্ব সমাধা করে আমাকে কৃতার্থ কর।

সংসারে আরও দুটি ছোট প্রাণী ছিল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আমাদের কাছে ঘেঁসেনি। যাদের মা প্রথম দর্শনেই আপনার করে নিয়ে এত স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করতে পারেন, তাঁর ছেলেরা কি করে এত লাজুক হয়? আমার বন্ধুর সংগে ওদের স্বভাবের মিল আছে, তার কথার তুবড়িতে কেমন যেন ড্যাম্প লেগে গেছে। ও খেয়ে-দেয়ে ঘুমের তোয়াজ করতে বসে, আমি চলি দিদির ঘরে গল্পের আসর ফাঁদতে।

কথাগুলো মজলিশি গল্প না পাকা ব্যারিষ্টারী জেরা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রশ্ন নয় ত প্রশ্নের তিক্ত বরিষণ।

বলি—সত্যি আপনার সুখের সংসার, যে কোন লোকের হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। তবু একটা কথা মনে জাগছে, বাংলা ছেড়ে এই পান্‌জাবে এসে বাস করছেন, দেশের জন্যে মন কেমন করে না?

—সুখের সংসার না ছাই!

বাংলাদেশের কথা বলছিলে, মাটির টান যে মলেও লোকের যায় না। কোন ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়েছি তা নিজেই জানি না, স্নেহ-ভালবাসার আস্বাদ পাইনি জীবনে, অনাথ-আশ্রমে মানুষ; বাংলাদেশেব কাছে তেমন আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছি বলে স্মরণ হয় না, তবু কেন জানি না, অন্তরে তার প্রতি এত গভীর আকর্ষণ।

একটু থেমে আবার বলেন, ফেলে আসা দিনগুলো কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না—সে যে বড় করুণ, সে যে অতি বড় সত্য। লেখাপড়া শিখেছিলাম, কিন্তু স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচবার শক্তি পেলাম কই? যৌবনে প্রলোভন এল প্রচুর, উচ্ছাসভরা মধুকণ্ঠ এল প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে; কিন্তু সে কুম্ভের পয়োমুখই সর্বস্ব—অনাথ-আশ্রমের মেয়েকে বাহুতে স্থান দেবে এই ত বড় কথা, তাই বলে বাহু-গ্রহণ করবে কোন সুবাদে? তাদের

জাতি-ধর্ম, সমাজ-সম্মান সব কি খুইয়ে বসেছে? সেদিন ধিক্কার এসেছিল জীবনে। যে সমাজ স্বীকৃতি দিল না, তার কাছে দুঃখ জানাব কোন লজ্জায়, অভিমান জানাব কোন অধিকারে?

সৌভাগ্য বলতে হবে, পান্‌জাবকে স্মরণ করাতে সে পারাণীর নাও এনে হাজির করল। আমাদের দল বেঁধে বিদায় দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। কেবল আশ্বাস ছিল, তেরো নদীর পারে আমি একা যাচ্ছি না, আরও দু-চার জন সম-ব্যথার-ব্যথীকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছি।

আজ ব্যথা নেই, দুঃখও নেই, আমার সংসার ত আনন্দময় সংসার, অথচ একটা বড় 'কিন্তু' মন থেকে কিছুতে দূর করতে পারলাম না। সংগীতের শুরুতেই যদি তাল কেটে যায়, সে কি ভোলা সম্ভব?

আবহাওয়টা হাল্কা করার জন্যে বলি—খবরদার ভুলবেন না, তবে সেই সম-ব্যথার-ব্যথী সংগীদের ভুলতে পেরেছেন ত?

—ধরেছ ঠিকই, একদিন আশংকায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। আজ আশংকা দূর হয়েছে, আক্ষেপও নেই……আর সংসার সামলাতেই সব ব্যতিব্যস্ত, ভুলবে না ত কি করবে?

* * *

দয়াহীন সংসার কিন্তু মায়াহীন হয় না কেন? পর্যটক জীবনে মায়ার খাদে পা আটকে কত না আছাড় খেতে হয়। মন সায় দিচ্ছিল না দিদির থেকে-যাবার-অনুরোধ অবহেলা করতে, কিন্তু যাযাবরী বৃত্তিটা টিকি ধরে টানতে থাকে।

দিদি বলে—কেন তবে আস্‌লে, বলতে পার? সুপ্ত ক্ষতকে খুঁচিয়ে তোমাদের লাভ হল কিছু?

—দিদি কষ্টটাই মাথা উঁচিয়ে দেখা দিল, স্নেহ এবং সম্পর্কের কোন দাম রইল না?

—মিথ্যে ভোলাতে চেষ্টা কর না, ভিজে গলায় কথাটা বলে তিনি

চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। বুঝলাম, আমাদের অকল্যাণের ভয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চোখের জলকে বাগ মানাতে।

আজ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ভারাক্রান্ত মন। চোখ মেলে কিছু দেখতেও মন সরে না। ছাড়িয়ে এলাম গুজ্‌রাণওয়ালা। ওয়াজিরাবাদ পেরিয়ে গুজরাট যখন পৌঁছলাম রাত হয়ে গেছে। সহরটা বেশ বড় এবং আলোয় সুসজ্জিত। জি টি রোড়ের ওপরই দুটি গুরদ্বোয়ারা রয়েছে। বৃহত্তরটি রণজিৎ সিংহের বাবার স্মৃতিরক্ষাকল্পে নির্মিত। এগুলো পেছিয়ে ফেলে, পেলাম হট্টমন্দির অর্থাৎ গরীবখানা—এ অতিথি-পরায়ণের বিনয়বাচক শব্দ নয়—গরীবের আশ্রয়স্থান।

* * *

গুজরাট থেকে যাত্রা করলাম ভোর বেলা। বহুদিন একঘেঁয়ে যাত্রার পর আবার নতুনের আস্বাদ পেলাম, বিহারের পর এই পশ্চিম পান্‌জাবের পথে মিলল পাহাড়ের দর্শন। বেশ বৃষ্টি নামল। রোদে পুড়ে পুড়ে দেহের ভেতরটা হয়ে ছিল বেসিমার কনভার্টার, জলে ভিজিয়ে তাকে করে নিলাম রেফ্রিজারেটারের অন্দরমহল।

ঝিলাম নদীর পারে আসতেই, পুরু অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে আসে, মহা আতংকে আত্মপরিচয় দিয়ে জানাতে হয়, আমি আলেকজাণ্ডার নই। তারপর করজোড়ে উভয়কে বলি, ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে পরীক্ষার সময় ব্যতিব্যস্ত করেছ, এখন ক্ষান্ত দাও।

বিরাট লম্বা ব্রিজ পেরিয়ে সামনেই পেলাম ঝিলাম রেলওয়ে ষ্টেশন। সহরে যেতে গেলে ডানদিকে বেঁকে মাইল দুয়েক যেতে হয়। লৌহবর্ত্ম-পরিচালকদের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ভোজনপর্ব সমাধা করে, বিশ্রাম-আগারে শয়নের ব্যবস্থা সেরে ফেললাম।

* * *

বিকেলে আমরা বেরোলাম বৃষ্টিও নামল। যেন তার সংগে কত দিনের

আত্মীয়তা। আত্মীয়ের অপূরণীয় দাবী থেকে আত্মরক্ষাকল্পে গাছের তলায় আশ্রয় নিতে হল। জেনে রাখুন আমরা নিঃস্ব নই, আমাদের ওয়াটারপ্রুফ আছেন, তিনি সাক্ষীগোপাল। এ গোপাল আবার তাঁর চারু-অংগ চন্দন-চর্চিত করেছেন—ছাপমারা আছে ওয়ার কোয়ালিটি। এই নব কলেবরে তিনি হয়েছেন ওয়াটার এব্‌সরবার। আবার এ মহাপ্রভুকে গায়ে চড়ালেই দর দর ধারায় ঘাম ঝরতে শুরু করে। যদি বলেন, ওই ভূতের বোঝা বয়ে লাভটা কি? গুণ বিচার করলে হয়ত গাঁটের কড়ি দিয়ে বিদায় করার যোগ্য কিন্তু করকরে টাকা দিয়ে নামজাদা দোকান থেকে কিনেছিলাম, বোঝার ওপর শাকের আঁটি সেল ট্যাক্‌স, সেও ত বেশ নাদুস-নুদুস ছিল; বলুন, প্রাণ ধরে একে কি বিদায় দেওয়া চলে?

এখনও বেশ পাহাড় ভাঙতে হচ্ছে। তিন চার মাইল ধরে খাড়াই উঠে গেছে, তারপর তিন চার মাইল ঢালু। মাঝপথে আবার বিশ্বকর্মার প্রয়োজন অনুভূত হল, কানুর সাইকেল গেল বিগড়ে। গিয়ারটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বিশ্বকর্মা সাজার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল কি না সন্দেহ। অধিকন্তু এক বিষম ব্যাপার, এ যেন শ্রীরাধিকার অভিমান, করজোড়ে অনুনয় জানালেও এক পা এগোবে না, ঠেলে নিয়ে যায় কার সাধ্য, সর্বশক্তিমান মহাদেব না হয় সখী গংগাদেবীকে জটার মধ্যে পুরে অবহেলে-হেসে চলে ফিরে বেড়াতেন, আমরা একে কাঁধে চাপিয়ে চলি কি করে? সে ধর্ম পালন করা কি পাখীর হাড়ের কর্ম? এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে, রাজপথে অনাহারে রাত কাটান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই অধমদের চেষ্টায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাইকেলখানা দু-চার ঘা খেয়ে শান্তশিষ্ট ছেলের মত দাঁত মিচকে হেসে উঠল। এত সহজে যে নিষ্কৃতি দেবে, তা ছিল ধারণার বাইরে।

সামান্য দূরেই পেলাম গ্রাম। তবে আজকের মত সবাই দোকানে পাটা তুলে দিয়ে নিদ্রা যাবার তদবির করছে; তাদের একজন জানায়,

থাকবার মত ঠাঁই লাভের বাসনা যদি থাকে, দেরী না করে চলে যাও সামনের ওই গুরদ্বোয়ারায়।

ভোজনদেবীর তুষ্টি সাধন করতে পারলাম না বলে শয়ন দেবীকে বিমুখ করব কেন? অনেক সাধ্য-সাধনার পর দ্বার উন্মুক্ত হল। কিন্তু ন স্থানং তিল-ধারণং। মই বেয়ে ছাতে চলে গেলাম আশ্রয়ের আশায়। মধ্য রাত্রে আবার বিপদ, এল ঝড় আর বৃষ্টি। কিন্তু গুরদ্বোয়ারার মধ্যে ঢুকব কোথায়? অন্তঃপুরে এক পা বাড়ালেই হয়ত কোন লম্বোদরে আকর্ষণ অনুভূত হতে পারে। ফলে সে যদি লগুড়-হস্তেন-সংস্থিত হয়, তার চেয়ে বরুণদেবের আশ্রয়ে অশান্তি ভোগ করা শ্রেয়।

* * *

ভোরে উঠে অন্যান্য যাত্রীরা রান্না চড়িয়ে দিল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম পথের সন্ধানে।

কানু আজ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও যখন ছোটে ওরা সংগে তাল রেখে চলা এক বিপদ, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে তাল কাটতেও ওর আপত্তি নেই। আজ বেশী দূর এগোন সম্ভব হল না, গুজরখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এক নব নির্মিত কৃষ্ণ-মন্দিরে।

রাওয়ালপিণ্ডিকে টারগেট করে বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম, বুল্‌স আই লাভ করার মত প্রফিশিয়েন্সি হয়ত ছিল, কিন্তু বাধ সাধল চড়াই আর উৎরাই। সন্ধ্যারতির সময় পেরিয়ে গেছে, আমরাও বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করছি, এমন সময় পেলাম এক পুলিশ ষ্টেশনের সন্ধান, বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম আশ্রয়ের আশায়। কর্তাব্যক্তিরা তখন মজলিশ করে খানাপিনায় মেতেছেন। এদের যা আকৃতি দেখলাম, আগে জানতে পারলে আমাদের বীরত্ব নিশ্চয় স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যেত, শত আশ্বাসেও চৌকাঠ পেরোতে পা উঠত না। সবাই বূঢ়োরস্ক-বৃষস্কন্ধ, এদিকে লম্বায় তমাল-তাল-তুংগ, এ যেন পাঠানের বাড়া, বাছাই করা দৈত্য। সবার গালপাট্টা দাড়ি—না

রেশমী না কালো, মাঝামাঝি এক রঙ। তারা বর্ণে হয়ত গৌর ছিল কিন্তু আবহাওয়ার শক্রতায় তামাটে হয়ে গেছে।

রাজধর্মে দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বন্দ নেই জানতাম, তবু সেই অতি সাধারণ প্রশ্ন, তোমরা হিন্দু না মুসলমান?

সোজাসুজি উত্তর দিলাম, ধর্মতত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের কম, সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে নিজেদের ছোট করতেও চাই না—আমরা পর্যটক, আমরা ভারতীয়, এইটেই আমাদের পূর্ণাংগ পরিচয়।

তাদের পরিচয়ের ঔৎসুক্য আমাদের ছিল না, কিন্তু যে জমাদারকে আমাদের সেবার জন্যে বরাদ্দ করে দিল, কি জানি কেন সে বলে, আপনারা নিশ্চয় হিন্দু, হেঁ-হেঁ আমিও হিন্দু। তবে সাহেবরা সব মুসলমান। ওদের খানা আপনারা খাবেন?

বলি—তোমরা চাকরিটি কি হারাতে বাসনা হয়েছে? বলে আসব কথাগুলো?

সে দ্বিতীয়বার আর ধর্মের কাহিনী শোনায়নি। খাবার এলো, রুটি আর মাংস। কি মাংস দিল জানলে লাভের কিছু ছিল না বরং লোকসানের আশংকা ছিল, সুতরাং তা নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করাই মংগল।

রাওয়ালপিণ্ডি

রাওয়ালপিণ্ডি বলে পরিচয় চাইবেন না, কেউ চিনতে পারবে না, রাওয়ালের সওয়াল নেই. পিণ্ডি বলুন পথ দেখিয়ে দেবে। এটা বৃটিশের এক বিরাট সামরিক ঘাঁটি। পান্‌জাবে যত ক্যান্টনমেণ্ট আছে ভারতের সকল প্রদেশ মিলিয়ে হয়ত এতগুলি নেই। জলন্ধর, আম্বালা, ফিরোজপুর, সিমলা, রাওয়ালপিণ্ডি, এটক; সামরিক সংবিধানে নামডাক আছে সবার।

পিণ্ডি চমৎকার সহর, পিচবাঁধান রাস্তা ঝক্‌ঝক তক্‌তক করছে।

দোকানগুলো দেখে মনে হয়, কলকাতার সাহেব পাড়ায় ঢুকেছি। সিনেমা হলগুলো সরগরম। প্রাসাদগুলো গগনচুম্বী না হলেও বেশ চাকচিক্যময়ী এবং তাদের সর্বাংগে যেন আভিজাত্য ফুটে বেবোচ্ছে। বুঝলাম, এমন সাহেব পাড়ায় আমাদেব কাযসিদ্ধি হবে না, এই ম্লেচ্ছদের মধ্যে মা কালীকে আশা কবাও পাপ। যদি অজ্ঞানে তেমন কোন অপবাধ করে থাকি, ক্ষমা চেয়ে নিলাম। এখন তিনি এঁদো গলিতেই থাকুন আর জাহান্নামে থাকুন, কালীবাড়ী আমাদের প্রয়োজন।

এক পথ-নিয়ন্ত্রক পুলিশ-প্রভুকে স্মবণ করি। বিনিময়ে সে পরিচয় জানতে চায়। কালীবাড়ীর সন্ধান করছি, বাঙালী নিশ্চিত, দু-চারটে বোমার সন্ধান যদি পায়? কিন্তু এ বোধহয় বোমার আঘাতেব চেয়ে সাংঘাতিক, তার বিলম্বিত শ্মশ্রুও প্রকম্পিত হয়। সামলে নিযে বলে, মিথ্যে কথা বলছ, তোমাদের অ্যারেস্ট করব।

—তাহলে ত বেঁচে যাই, একটা পাকা আশ্রয় মিলবে। কথাটা শুনেই ত তোমার চক্ষু চডকগাছ, ট্র্যাফিক সিগ্‌নাল দিতে ভুলে গেছ পাঁচ মিনিট। নথিপত্র সব দেখলে মাথা ঘুরে পথের মাঝে হয়ত বে-ইজ্জৎ হতে হবে। দেখবে, আমাদের তস্‌বিব বেরিয়েছে বড বড় আক্‌বাবে?

—কলকাতা থেকে বরাবর সাইকেলে? শুনেছি বটে বাঙালীরা যাদু জানে, ওরা সব কিছু করতে পাবে, বড বড মানুষকে ধরে ভেড়া বানিযে বাখে, তাদের পক্ষে অসম্ভব নয় এটুকু সাইকেলে আসা?

বললাম—সাবধান, প্রমোশন পাবার সম্ভাবনা থাকলেও কোন দিন বাংলাদেশে যেও না, ভেডা হয়ে কার আস্তাবলে জীবন কাটাতে হবে।

* * *

কালীবাড়ী সহরের এক প্রান্তে। এখানে দিবারাত্র ওই এক কথা, কলকাতা আর কলকাতা, সবাই কলকাতা-ফোবিয়ায আক্রান্ত। বাঙালী মহলে উত্তেজনা বেশী, তারা যে সাক্ষাৎভাবে জডিত। স্থানীয় আবহাওয়ার

সংবাদে প্রকাশ, দুর্যোগের আশু সম্ভাবনা আছে। এদিকে গেস্ট্যাপো বাহিনীর কন্‌ফিডেন্সিয়াল বুলেটিন আসে—এত বন্দুক, এত হাত বোমা, এত অস্ত্রশস্ত্র আজ বিলি হয়েছে; সহরের কিছু থাকবে না, সব শ্মশান হয়ে যাবে। এসব আলোচনা চলে কানে কানে, ফিস্‌ফিসানী এর টেকনিক। চুপ-চুপ, কে কোথায় শত্রুপক্ষ আছে বলা যায় না, সব জেনে ফেলবে! তাই এখানকার চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড় সব থেমে গেছে। কচি ছেলেরাও বোধহয় বিপদ উপলব্ধি করেছে, তারা কান্না গেছে ভুলে! আরও বিধি-নিষেধের পরোয়ানা আসে, যেখানে সেখানে খেয়ে বেড়ান এখন আত্মহত্যা করার সামিল। আমরা আবার ম্লেচ্ছ হয়েছি, জাতি বিচারের বালাই নেই, তাই সাবধান বাণী আমাদের ওপর গর্জে ওঠে—খবরদার অমুক নিজের কানে শুনে এসেছে, খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, তীব্র বিষ।

ইদ-উ-জ্জোহা মুসলমানের পবিত্র উৎসব। শত্রু-মিত্র ভুলে সেদিন পরস্পর পরস্পরকে আলিংগন করে, অথচ সবার মন আজ আতংকগ্রস্ত, তারা যেন আনবিক বোমার লক্ষ্যস্থল। সমস্ত সহরে কড়া পাহারা, উৎসব বুঝি বা পুলিশ আর মিলিটারির। সুন্দর পোষাক আর সুন্দরতর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মনের আনন্দে রাজপথ প্রকম্পিত করছে।

এদিকে গুরুমন্ত্র শুনেছি শ্রবণে। আজকের দিনে পথঘাট, সে ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার, নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পাদদেশ, এভালান্‌চ প্রবাহের পথ। এতগুলো দৃশ্য পথে বেরোলে একসংগে দেখা যাবে, তাই লোভ সামলান একটু কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। এমন সময় আর এক মহারথী এলেন; তিনি বলেন, আপনারা শুনি একটু একরোখা লোক আজ কিন্তু সাবধান, জেনে রাখুন সব শান দিয়ে রেখেছে, রাস্তায় দেখলেই···ব্যাস।

বলি—এই যে শুনলাম, এত গোলাগুলি, হাত বোমা, সব ভুয়ো! আধুনিক যুগের মানুষ, প্রাণ যদি দিতে হয় আধুনিক অস্ত্রকে আলিংগন করেই তা উৎসর্গ করব, প্রত্নপ্রস্তর যুগে ফিরে যেতে কোন মতেই রাজি নই।

—এমন গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন না।

—ও অপবাদ দেবেন না, বরং বলতে পারেন গান্ধীজীর বাণীতে আমাদের গভীর আস্থা—হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই সে কথা বলছি না; তিনি বলেছেন, সামান্য যেটুকু শক্তি আছে কথার পেছনে অপব্যয় না করে কাজে লাগাবার চেষ্টা কর। তারপর ধীরে-সুস্থে দুই বন্ধুতে পথে বেরিয়ে পড়ি।

নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় পথে বেরিয়েছিলাম কিন্তু রাস্তায় জনমনুষ্য না দেখে মনটা সত্যি দমে গেল। বুঝলাম, এতখানি বীরত্ব দেখান খুব অন্যায় হয়ে গেছে, প্রায়শ্চিত্তের মূল্যস্বরূপ প্রাণটা না যায়। কালীবাড়ী ফিরে গেলে হয় কিন্তু তাহলেও পর্যটকের মর্যাদায় আঘাত লাগে; তাই রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারে সিংহের মুখে নিজেকে উৎসর্গ করার আনন্দে এনড্রক্লিস যেমন এগিয়ে গিয়েছিল, আমরাও চললাম—টপ-গিয়ারে-চলা রোল্‌স, নিথাগী ঘোড়ায়-টানা ছ্যাকরা গাড়ীতে পরিণত হল। আশ্বস্ত হতে পারেন, সিংহের দেখা আমরা পাইনি বরং পেলাম এক বন্ধু। তবু ভয়, শেষে সাম্যবাদের ধুয়ো ধরে আমায় অপরাধীর কাঠগড়ায় না দাঁড় করান; কিম্বা নিচু নজর বলে নাক সিঁটকে ওঠেন।

বন্ধ দোকানের সারির ফাঁকে দেখি এক মুচি গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি কুটো দেখতে পেলেও আনন্দিত হয়। আলাপ করার সুযোগও জুটে গেল, আমাদের জুতোজোড়াটার ওপর একটু কারুকার্য করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেও পথ দেখিয়ে দেয়, তার মনোগত ভাব, আজকের দিনে এত কাজ করেই সে এক অন্যায় করে ফেলেছে, বকশিশের লোভ সম্বরণ করতেও এখন পিছ-পা নয়।

বোকার মত বললাম, হিন্দুর জুতোয় কি আজ হাত দিতে মানা?

বলে—না বাবু, আমরা গরীব, দুটি খেয়ে জীবন বাঁচান দায়, ওসব চিন্তা করব কখন?

ওষুধ ধরল, যখন শুনল কলকাতা থেকে সাইকেল করে এসেছি। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে, কি সম্মানসূচক কথায় সম্বোধন করবে স্থির করতে গিয়ে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ে। শেষে বলে, দিন সব কাজ ফেলে আপনারটাই করে দেব।

* * *

কালীবাড়ী বললে কি ধারণা হয়? শক্তিরূপিনী জাগ্রত দেবী আছেন, পুরোহিত মশাই আছেন—পূজাপার্বণ হয়, নামসংকীর্তন, দোলদুর্গোৎসব হয়। আসলে এখানকার রূপটি ঠিক তা নয়, মন্দিরটি সেকেণ্ডারি, প্রাইমারি ব্যাপার একদল বাঙালী জোট পাকিয়ে আস্তানা গেড়েছে। প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডারা দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠানের বড় একটা ধার ধারেন না, সে দায়টা পুরোহিতের। তা তিনি মাসে মাসে নিয়মিতভাবে মাইনে নিচ্ছেন, ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছেন, হয়ত পেনশেনও পাবেন, অভাবে কিছু গ্র্যাচুইটি। সুতবাং মাতব্বরদের পক্ষে মায়ের চিন্তা করার থেকে ততক্ষণ ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, পিংপং, ফুটবল এইসব খেলার বিষয় চিন্তা করলে কাজে দেবে। এখানে লাইব্রেরী আছে, বাংলাভাষায় হাতেলেখা পত্রিকাও মাঝে মাঝে মাথা ফুঁড়ে বেরোয়। তবে এঁদের সব থেকে প্রিয় অনুষ্ঠান হল, সখের থিয়েটার। পাকা ষ্টেজ বাঁধা আছে, পূজাপার্বন শুরু হলেই সিন খাটানর বহর দেখা দেয়। আর দুর্গাপূজোয় রেকর্ড, পর পর পাঁচদিন থিয়েটার। সে সময় আশে-পাশে যে সব বাঙালীরা থাকেন তাঁরাও এসে জমায়েৎ হন, কদিন ধরে খুব হৈ-হুল্লোড় করেন। সব থেকে মজার কথা, মুসলমানরাও কালীবাড়ীর সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত নয়।

কালীবাড়ীর সাংগ-পাংগদের এখন কলকাতা-ফোবিয়ায় পেয়েছে আর আমাদের ধরেছে অর্থসংকট-ফোবিয়ায়, দুটোরই কোন ট্রিটমেণ্ট নেই প্রিভেণ্টিভও কিছু নেই। আমাদের ধ্যান-জ্ঞান হল টাকা; কবে এই অমূল্য রতন বাড়ী থেকে আসবে, সেই প্রতিক্ষায় কাল গুণছি। বর্তমানে আমাদের

প্রভুপাদ হলেন পোষ্ট অফিস, প্রতিদিন কৃতাঞ্জলিপুটে হাজির হতাম তাঁর পাদপদ্মে, বরদাত্রীর কাছে একমাত্র প্রার্থনা ধনং দেহি কিন্তু মহামায়ার মন কি অত সহজে মেলে ?

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল, একদিন সত্যি সত্যি টি-এম-ও এসে হাজির ; সেদিনকার আনন্দের কথা ভাষায় বোঝাতে আমি অক্ষম। পথের মাঝেই বেহায়ার মত তাকে আদর করতে শুরু করলাম, যাইহোক অব্‌সিন বলে যে লোকে আইনের আশ্রয় নেয়নি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; মুখ টিপে হাসাহাসি করলে কিছু যায়-আসে না, তাতে গায়ে সামান্যতম আঁচড় লাগবারও সূচনা দেখা দেয় না।

তক্ষশিলা

আবার নতুন করে যাত্রা করলাম, এই কদিন যেন দুর্যোগ বয়ে গেল পর্যটক জীবনে। পথ চলতে চলতে বহু দিন বাদে আজ আবার পাহাড়ের দর্শন পেলাম। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, দু-পাশের পাহাড় রাস্তাকে অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, আসলে সে অবরোধের নায়ক সেজেছেন নিকলসন। ভাবতেও দুঃখ হয়, এই সর্বজন-পরিত্যক্ত পথে হল বীর নিকলসনের শেষ আশ্রয়। সেই স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লেখা :

Here lies Brig. John Nicholson who defended the British India in four wars.

1. Kabul war in 1840
2. 1st Sikh war in 1845
3. 2nd Sikh war in 1848
4. Shipoy Mutiny in 1857

Died 3rd August in 1857 in action.

ব্যাচারা নিকলসন, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রু-সৈন্যকে বিপর্যস্ত করে প্রাণ দান করলেন ভারতের বুকে, অথচ ভারতবাসীর কাছে পেলেন অকুণ্ঠ অভিশাপ; সিপাই-বিদ্রোহে স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় হয়েছিলেন তিনি। আর ইংরাজ, যাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ করলেন প্রশস্ত, তাদের কাছে লাভ করলেন আত্মার আনুষ্ঠানিক শুভ-কামনা, কারও হৃদয়ে স্থান পেলেন না এক দিনের তরেও।

তক্ষশিলা পিণ্ডি থেকে সামান্য কয়েক মাইল দূরে, জি টি রোড ছেড়ে আড়াই মাইল গেলে মেলে প্রত্নতাত্ত্বিক মিউসিয়াম। বেলা দুপুরে পৌছলাম সেখানে। মিউসিয়ামের কিউরেটর কালীবাড়ীর সভ্য, সুতরাং আমাদের সম্বর্ধনার অভাব হল না। অতিথিশালার ঘর খুলে দিলেন। ঘরগুলো ভারী চমৎকার, সুখ-সুবিধার সকল রকম ব্যবস্থাই আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাঁদের বার্ষিক গতির নিয়মিত ধারায় এখানেও প্রতি বৎসর কিছুদিন কাটিয়ে যান।

তক্ষশিলা নামের জড়াপটকি বাঁধান সমস্যায় মাথা গলিয়ে দিলাম। তক্ষশিলা নাকি ছিল গন্ধর্বরাজের টেরিটরি। রি-এড্‌যাষ্টমেণ্ট অফ বাউণ্ডারী বলা যায়, রামরাজত্বে ভরত অহিংস ভাবে পলিটিকাল প্রেশার দিয়ে নিজ-রাজ্যভুক্ত করেন। পরে দানপত্র লিখে দেন রাজপুত্র তক্ষকে। এই অভিশপ্ত ভূমিতেই জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করেন। নামের উৎস সন্ধানে বেরোলে, এই ঘটনাগুলো তক্ষশিলা বলার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলে মনে হয়।

তবে অপোজিশন গ্রূপ চিরকাল থাকে; তাঁরা বলেন, উঁ-হুঁ, রামায়ণ মহাভারতকে টেনে এনো না, আসলে এতে আছে বুদ্ধপ্রশস্তি, তাঁর আত্ম-দান। তক্ষ হল বুদ্ধ, তক্ষশিলা তক্ষশিরের অপভ্রংশ! এক জন্মে বুদ্ধদেব কোন ব্রাম্হণকে নিজের মস্তক দান করেছিলেন, তাই এই নামকরণ।

এবার বন্ধুর ইতিহাসপর্ব মাথা তোলে, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই তক্ষশিলা ছিল ভারতের এক বিখ্যাত সহর। ভাঙা-

গড়া হয়েছে বহুবার, বিভিন্ন জাত এই রংগমঞ্চে প্রলয় নাচন দেখিয়েছেন, আবার নতুন উদ্যমে স্মরণ করেছেন বিশ্বকর্মাকে। তবে রাজা অম্ভির বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁর ইয়েস স্যার, ইয়োর অনার বৃত্তি অনুকরণীয়। আলেকজাণ্ডার ভারতের পথে পা বাড়াতেই তিনি গলবস্ত্র হয়ে ছুটলেন, ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে প্রভুপাদে প্রণতি জানালেন।

তিন দিন ভূরিভোজ করার পর আলেকজাণ্ডার বিদায় নিলেন। গ্রীস দেশের জাতিতত্ত্বে তিনি পৈতেধারীর স্তরে পড়েন কিনা জানি না, তবে ক্ষাত্রবৃত্তির কোন নমুনা সাময়িকভাবে দেখা গেল না, বরং তিনি রাজা অম্ভিকে আশীর্বাদ করে গেলেন; হোষ্ট হিসেবে তিনি যে ভাল এণ্টারটেনার এমন প্রশংসাপত্রও দিয়ে গেলেন।

এমন সূক্ষ্মবৃত্তির বেড়া দিয়ে কি সকলকে প্রতিরোধ করা চলে বা সকলে সে বৃত্তি গ্রহণ করতে রাজি থাকে? ক্রমে মহামানব মৌর্যরা অনুগ্রহ দেখালেন, বহ্লীক, পহ্লব ও কুশানরাও তাঁদের চরণচিহ্ন রেখে গেছেন। সবার আক্রমণ মোটামুটিভাবে গা সওয়া ছিল; শ্বেত হূণরা জানাল, অমন দগ্ধে দগ্ধে মেরে কি লাভ? যদি অনুগ্রহ দেখাতে হয়, একবারে দেখানই ভাল। তারা লুটপাট করল, বাড়ী-ঘর-দোর যা পারল ভাঙল, শেষে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর হিউয়েন সাঙ এসে বোধ হয় আমাদের মত প্রেতপুরী দেখেছিলেন। তবে ব্যাকরণবিদ পাণিনি, কুটিল চাণক্য এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ জীবক এই তক্ষশিলার বেত খেয়ে মানুষ হয়েছেন। ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে ছাত্রবৃন্দ এখানে আসত এই বেতের সন্ধানে, তিন বেদ আর আঠের বিদ্যা শিখতে কত অক্ষৌহিনী বেত আর তার কতগুণ টিকি নাড়া খেতে হত, ভাবতেও আতংক জাগে। তবে একটা ভাল রেফারেন্স, গার্জেন-মারা-কল পরীক্ষার তখনও পত্তন হয়নি।

* * *

গেলাম তক্ষশিলার মিউসিয়াম দেখতে। সবার আগে যে দৃষ্টি

আকর্ষণ করল, সে হল বিগত দিনের তক্ষশিলার মডেল, আমাদের আলমারীতে সাজান তাজমহল বা কুতুবের মত। তবে এখানকার মডেলটি পাণ্ডিত্যের পরোয়ানা দিয়ে বন্দী করা। বিভিন্ন জাতির রাজত্বকালে তক্ষশিলার প্রতিমূর্তি, পুরোনো বিধ্বস্ত সহরের পাশে নতুন সহর, সব সাজান আছে, হূণদের কীর্তি-কলাপকেও ছোট করেনি, অর্ধদগ্ধ স্তূপের প্রতিমূর্তিতে রেখেছে যথাযথ ক্ষতচিহ্ন।

মডেল ছেড়ে হারেমে পা বাড়াতেই প্রথম নজরে পড়ে সে যুগের মাটির পাত্র, যা দেখেই বলা যায় মাটি হয়নি সময়টুকু। কয়েক হাজার বছর অতীতেও ভারতবাসীরা আজকের মত হাড়ি, কড়া, গামলা ব্যবহার করত। দান করার মালিকানাস্বত্ব কারও থাকলে, এখানে সাজান ওয়াটার বট্‌লটা চেয়ে নিতাম। পাশেই জল পরিশ্রুত করার যন্ত্র, অভাব ছিল না কিছুরই।

মৃত্তিকার পাশেই ধাতব সামগ্রী সুসজ্জিত হয়ে বিরাজ করছে—ছুরি, কাঁচি, সাঁড়াশী সব কিছুরই সন্ধান পেলাম।

ভূর্জিপত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যন্ত্র-সভ্যতার সামান্য আঁচড়ও তাতে মিলবে না, তবে তার বক্ষপঞ্জরে অতীত যুগের যে সাহিত্য পাওয়া গেছে, তা নাকি অমূল্য রত্ন। তা-ছাড়া এখানে সেখানে টাকাটা সিকিটা পড়ে রয়েছে ; পার্চমেণ্ট পেপারের উদ্ভব তখনও হয়নি, তাই নোটের সন্ধান মিলল না, তবে মেটালিক ও ননমেটালিক উভয় ধরণের মুদ্রাই ছিল।

পাষাণের বক্ষ ভেদ করে যাদের জন্ম, মাটির মানুষের অবহেলা সইবে কেন ? রুখে ওঠে। তাদের তুষ্টিসাধনকল্পে বেশী সময় দিতে হয়। স্থাপত্য শিল্পে বৌদ্ধদের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার—সংখ্যায় এবং সুকুমার ধর্মে তাদের সমান আধিপত্য। বৌদ্ধদের অফিসিয়াল সিল ছিল ছোট বুদ্ধমূর্তি বা হস্তীর প্রতিকৃতি, তাদের গড়া প্রত্যেকটি মূর্তির কোণে সে প্রতীক-চিহ্ন বর্তমান। গ্রীকদের নিদর্শন আঙুরগুচ্ছ, অভাবে তার লতাপাতা। হিন্দুদের প্রতীক বিষ্ণুমূর্তি, শংখ বা পদ্ম।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে আসার পর জ্ঞানীজনেরা আমাদের অজ্ঞতার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন। তাই তাঁদের সংগে গলা মিলিয়ে বলতে হল, তক্ষশিলার স্থাপত্যে বারাণসী বা মথুরার মত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু মেলে না। তার কিছু গান্ধারা শিল্পের অনুকরণে গড়া, কিছু বা সওয়াৎ উপত্যকার সৌজন্যে পাওয়া।

অলংকার-শাস্ত্র দিয়ে সমাপন করাই বোধহয় সব থেকে সুশোভন। সবার শেষে আমাদের গাইড নিয়ে গেলেন সুরক্ষিত মূল্যবান রত্নের ঘরে। নারীর সৌন্দর্য চিরকাল পুরুষের মনে আগুন জ্বেলেছে; তার জ্বালানি সংগ্রহে নারী ছুটেছে স্যাকরা বাড়ী, ভাঙাচোরা সৌন্দর্যে রিপুকর্ম চালাতে। সেদিনের সৌন্দর্যাভিমানীর সৌখীনতা ছিল আরও সাংঘাতিক, হাতের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে বাহুমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হত অলংকাররাজি। সোনাদানা না হয় নাই বা পাওয়া গেল, অন্যান্য ধাতুর নিশ্চয় অভাব হবে না!

অনুমান করা হয়, এই অলংকাররাজি মিলেছে এক স্বর্ণকারের সেফটি-ভল্ট-এ। অন্যান্য অলংকারের কথা বাদ দিয়ে, স্বর্ণালংকারগুলো বিচার করলে সে যুগের শিল্পচাতুর্যকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। বিশেষজ্ঞের মত জানি না, তবে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে বলতে পারি, সে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধ প্রশংসার যোগ্য।

দেখা শেষ হয়ে গেল। বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করল এক অদ্ভুত জিনিষ, এ যে প্রাচীরের এগ্‌জিবিশন, শো-কেসে পাশাপাশি সাজান বিভিন্ন ডিজাইনের মত। ভিন্ন ভিন্ন গঠন-প্রণালীর প্রাচীর পর পর গাঁথা। জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে এমন অদ্ভুত পাঁচিল গড়ার সার্থকতা কি?

শুনলাম, এটা প্রাচীর নয়; দর্শনীয় বস্তু, এক এক যুগের দেওয়ালের গঠন-প্রণালী সময়ের ক্রম অনুসারে পর পর সাজান আছে। এই দিয়ে সভ্যতার ক্রমবিকাশ চমৎকার উপলব্ধি করা যায়।

* * *

বিকেলে বেরোলাম রংগমঞ্চের পাদপীঠে। তক্ষশিলাকে মিউসিয়ামের আলমারীতে না দেখে তার বুকের ওপর দিয়ে সদর্পে চলে যাব। সার জন মারশ্যালের মারশ্যালি বৃত্তির জন্যে আজ সম্ভব হয়েছে এই মৃত্তিকাগর্ভে নামা। এখনও এর পূর্ণাংগ রূপ বিকশিত করা হয়নি, অংশ বিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ভীর মাউণ্ড-এ যে সব বাড়ী-ঘর-দোর গড়া হয়েছিল আভিজাত্যে সে মোটেই কুলীন নয়। তার পাশেই মৌর্যযুগের সহর পাওয়া গেছে, তাকে আলোকপ্রাপ্ত বলা যায়। গ্রীকরা এসে আরও মাইল খানেক দূরে চলে গেল, উঁই-এর টিপি হলেও উচ্চ আসনে তারা আসীন হবে। তাই পাহাড়ের মাথায় গড়ল সহর।

গ্রীকরা গণিত ছাড়া কথা বলে না; এমন কি শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ-নীতি সর্ব বিষয়ে অংকের ঝাঁজ আছে। তাদের স্থাপত্যের গোল্ডেন রুল হল গোল্ডেন সেক্‌শন মেনে চলা। তাই দেখলাম, সহরের পথ-ঘাটও গড়েছে জ্যামিতির প্যারালালইসম আর রাইট অ্যাংগল পদ্ধতিতে।

চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তূপ আর বুদ্ধমূর্তি। সুতরাং এখানকার সভ্যতা-সৃষ্টির অধিকারী রূপে, বুদ্ধদেব বা তার চেলা-চামুণ্ডের দাবী অগ্রগণ্য। সব থেকে বড় এবং বিখ্যাত স্তূপটির নাম ধর্মরাজিকা। অনেকটা নালন্দার বৃহত্তম স্তূপের মত, সিঁড়ি আছে ওপরে ওঠার, তবে মাথার ওপর কিছু নেই। মনে হয়, কোন বড় মন্দির বা বুদ্ধমূর্তি ছিল এখানে। জুলিয়ান এবং মোরা মোরাদুতে বহু বৌদ্ধস্তূপ ও মঠের নিদর্শন পাওয়া গেছে। রঙ-চঙে বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে এখানে সে নমুনা পাওয়া যায়। এক গুহার মধ্যে এমন এক বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি দেখে তাজ্জব লাগে।

পাঠক সমাজ হয়ত হাঁফিয়ে উঠেছেন, বৌদ্ধস্তূপের বিরাট সমুদ্রের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছেন; ভাবছেন, এর থেকে কি নিষ্কৃতি নেই? তা আছে, তবে শেষ পরীক্ষা এখনও বাকি। সেখানে ইতিহাস নেই, মাটি-পাথরের

ডকুমেণ্টও নেই, আছে উপকথা। কিন্তু সবাই যখন তা মেনে নিয়েছে, আপনাকেও মানতে হবে; এ যে ডেমক্রেসির যুগ।

কুণালস্তূপ নাম শুনেছেন? ধর্মরাজিকা-স্তূপের নামান্তর। এ নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই, লেখা আছে মানুষের বেদনা-বিধুর হৃদয়ের কোণে। ঘনকৃষ্ণ আয়তনেত্রের অশ্রুবিন্দু, তার ভাষা যে আরও প্রাঞ্জল, তার স্থায়িত্ব যে শাশ্বত!

*　　　*　　　*

সাগর ছেঁচা মাণিক, সবার আদরের ধন, মহারাজ অশোকের নয়নমণি সেই রাজকুমার। দেখতে যেন স্বপনপুরীর রাজপুত্তুর, আর সব থেকে অপরূপ তার চোখ দুটি। চোখের এমন মনোমোহন রূপ আর কেউ দেখেনি, সে চোখের দিকে চাইলে লোকে সব ভুলে যায়; তার প্রতি স্নেহে-ভালবাসায়-আকর্ষণে ভরে ওঠে তাদের মন। ও যেন সদ্য প্রস্ফুটিত নীলকমল।

এমন নীলঘন নয়ন ত মানুষের দেখা যায় না! তবে হিমালয়ের বুকে আছে এক সুন্দর পাখী, কুণাল; এমনই সুন্দর তার নয়নমণি! তাই রাজকুমারের নাম হল কুণাল।

দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে রাজকুমার। রূপে, গুণে, শিক্ষায় সে অদ্বিতীয়, শিল্পকলায় অসীম আগ্রহ, তার সংগীতে ধ্বনিত হয় দেববিনিন্দিত স্বর, অংগুলি স্পর্শে বীণা তোলে অপূর্ব লহরী। দেশ-জোড়া তার খ্যাতি, সে সবার আদরের ধন, সবাই করে তার শুভ-কামনা।

প্রথম বাদ সাধলেন রাজ-জ্যোতিষী। তিনি বড় বেদনার সংগে বলেন, এই নীল নয়নপদ্ম দুটি হবে ওর পরম অভিশাপ, ওর জীবনের সব থেকে বড় দুঃখের কারণ। কালক্রমে সবাই ভুলে যায় সে কথা। মাটির মানুষ যে কেবল অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রূপই কল্পনা করে, অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরাতে সে নারাজ।

মহারাণী পদ্মাবতীর মৃত্যু হল, কুণাল হল মাতৃহারা। দ্বিতীয় মহারাণী

এলেন তিষ্যরক্ষিতা। কূণাল তাঁকে মায়ের মত শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা জানায়, গড়ে ওঠে মধুর সম্পর্ক। কিন্তু এই সুমধুর সম্পর্কের সীমানা নিয়ে বাধল বিরোধ।

একদিন নির্জন ঘরে বসে কূণাল স্খলিত কণ্ঠে গাইছে গান, যেন স্বর্গের সুষমা ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে, সুরের সে মূর্ছনা পাগল করে মানুষকে। আর যে ওই ঘন নীল নয়নযুগল, ও যে আরও পাগল করা, আরও মোহময়! তিষ্যরক্ষিতা পারে না নিজেকে সংযত রাখতে, ছুটে গিয়ে তাকে আলিংগন-বদ্ধ করে, বাহুর মাধবীলতা দিয়ে বাঁধতে চায়!

একি শুনছে কূণাল! নিজেকে বিশ্বাস করতে বাধে, কানে আঙুল দেয়। বলে—তুমি না আমার মা, অমন কথা বল না, আমি তোমায় মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করি।

রাণীর প্রেম বাঁধন মানে না—কি তীব্র-তিক্ত আকর্ষণ ওই নীলকমলে, রূপসাগর মন্থন করে গড়া যে ওই সুধার আকর, ওই বিষভাণ্ড—রাণীর চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা!

রাজার কুমার সইবে কেন সে কলংকের বন্ধন। প্রণয়ের পরিবর্তে হল শ্রদ্ধার অপমৃত্যু, করল অপমান আর তিরস্কার। শেষে ঘৃণায় রাণীর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিতেও তার আত্মমর্যাদায় বাধল, তাই প্রত্যুত্তরে তরবারি কোষমুক্ত করে লক্ষ্য করল তিষ্যরক্ষিতার প্রতিচ্ছবি, বিদ্ধ হল প্রতিকৃতির চোখ।

তিনি না মহারাণী, ভারত জোড়া সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী, এ অপমান তিনি সইবেন না, উপযুক্ত প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে।

রাণী বহুবার চেষ্টা করেন তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা সফল করতে কিন্তু সকল প্রয়াস বার বার ব্যর্থ হতে থাকে। কূণালের চরিত্র-মাধুর্যে, সরলতায়, আন্তরিক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ—স্নেহে-সৌহার্দ্যে-শ্রদ্ধায় সে

সকলকে জয় করেছে। ব্যর্থতায় আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মহারাণী, গর্জন করতে থাকেন ফণিনীর মত।

*   *   *

সুদূর তক্ষশিলায় দেখা দিল বিদ্রোহ। অশোক নিজেই যাবার মনস্থ করেন। মহারাণী বলেন—কেন, উপযুক্ত সন্তান কুণাল রয়েছে, সে ত যেতে পারে, অনায়াসে এ কাজের ভার তাকে দেওয়া যায়।

সেই ত ভাল হবে। মহারাজের এ-কথা মনেই পড়েনি। ঠিক হল, কুণাল যাবে তক্ষশিলায়, বিদ্রোহের অবসানে সে হবে সেখানকার শাসনকর্তা। আর এক বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, এই সংকেত-চিহ্ন দিয়ে যদি কোন আদেশ পাঠাই, তা অবিলম্বে কার্যকরী করবে।

বিচ্ছেদ-ব্যথায় বিষাদমগ্ন রাজধানী ছেড়ে কুণাল চললেন তক্ষশিলায়। সেখানে যেতেই বিদ্রোহীরা অস্ত্র ফেলে গাইল আবাহনী বন্দনা, মহা-আনন্দে সমারোহ করে নিয়ে বসায় রাজসিংহাসনে—এবার প্রজারা সুখে-শান্তিতে থাকবে, রাজ-প্রতিনিধির অত্যাচারের হবে অবসান। কুণালের মনও ভরে উঠল তাদের আন্তরিকতায়। তাঁর আত্মীয়-বিচ্ছেদ ব্যথার কাতরতাও সময়ের পদক্ষেপে মন্দীভূত হয়ে আসে। তিনি সেখানে গড়ে তোলেন শান্তির নীড়। প্রজারা অনুরক্ত, সংগে আছে প্রিয়তমা জীবন-সংগিনী, দুঃখ কি তাঁর। প্রজাদের সঙ্গে মিলে-মিশে বেশ আনন্দে দিন কাটান, অবসর সময়ে মূর্চ্ছনা তোলেন বীনায়, সেও কত মধুর, কত শান্ত, কত আবেশময়।

এদিকে মহারাজ অসুস্থ হয়েছেন। দেখা দিয়েছে তাঁর জীবন-সংশয়। তিনি বলেন, কুণালকে আহ্বান করে আন, সে এসে সকল ভার গ্রহণ করুক, আমার খেলা যে সাংগ হল।

কুণাল এসে গ্রহণ করবে রাজ্য ভার? চঞ্চল হয়ে ওঠেন মহারাণী, তা-হলে যে সর্বনাশ! তিনি মহারাজকে বলেন—আর কিছু দিন অপেক্ষা

কর, আমাকে শেষ বারের মত চেষ্টা করার অবসর দাও। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে ?

মহারাণী সেবায় এবং বুদ্ধিমত্তায় তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তখন মহারাজ বলেন—তোমার মনে যদি কোন বাসনা থাকে, তা-হলে আমি তা পূর্ণ করব।

—কিছু নয়, কেবল সাত দিনের জন্যে রাজ-সিংহাসন।

—রাজ-সিংহাসন, সে ত চিরকালই তোমার ! আচ্ছা তোমার সেই বাসনা পূর্ণ হোক।

তিষ্যরক্ষিতা দেখলেন এই সুবর্ণ সুযোগ, কূণালের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অবসর আর মিলবে না, এত দিনে বুঝি বা তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে !

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—কেঁপে উঠল দিক-বিদিক, প্রকট হয়ে উঠল তার নগ্ন রূপ—ঈর্ষা, বিদ্বেষ, শঠতায় ভরা, নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাসে তা জর্জরিত। এই ত মহারাজ অশোকের সেই বিশিষ্ট সংকেত-চিহ্ন, রাজমোহর-অংকিত হয়ে আদেশ এসেছে তক্ষশিলায়। তাতে স্পষ্ট লেখা, কূণালের চোখ দুটি উৎপাটিত করে তাকে ভিখারীর বেশে রাজপুরী থেকে নির্বাসন দেবে।

কেউ এ আদেশ বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, আকাশে সূর্য-চন্দ্র থাকতে এ তারা মানতে রাজি নয়—এ মিথ্যা—নিশ্চয় কোন কূট চক্রান্ত আছে এর মধ্যে, আছে গভীর ষড়যন্ত্র।

কূণাল হেসে বলেন, পিতার আদেশ অমান্য করি, আমার জ্ঞানী পারিষদবৃন্দ এই কি চান ? তাঁরা কি এই মন্ত্রণাই আমায় দেবেন ? পিতার আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারি না, এ যে আমার ধ্যান-জ্ঞান, এ যে বেদ-বেদান্ত, এর কাছে আমার জীবনও তুচ্ছ।

মহা সমস্যা দেখা দিল, কে অমন নয়নাভিরাম নয়ন-পদ্ম দুটি উৎপাটিত

করবে? মহাপাতকের ভাগী হতে পারে কিন্তু এত নিঠুর-নিলাজ হতে তারা রাজি নয়। তখন কুণাল তাঁর স্বর্ণমুকুটের লোভ দেখিয়ে বলেন, যে আমার আদেশ মাথা পেতে নেবে, তাকে উপহার দেব এই বহুমূল্য পুরস্কার।

এক নীচ, কদাকার ঘাতক লোভের মোহে সেই নীল-নব-ঘন নয়নমণি দুটি উৎপাটিত করে, মহামূল্য মুক্তাবিন্দু চিরদিনের মত দীপ্তিহীন হয়। ঘন অন্ধকার নেমে আসে, জগৎ আজ মহাশূন্যে ভরা, বিশ্ব আজ সৌন্দর্যলেশহীন।

* * *

মহারাজ অশোক রাজকার্যে ব্যস্ত, এমন সময় কানে ভেসে আসে বীণার করুণ স্বর—যেন বিষাদ-সিন্ধু মথিত করে সে আসছে, প্রাণের তন্ত্রীতে সে স্পর্শ করে যায়। কিন্তু এ স্বর যে তাঁর অতি পরিচিত! এ কি, সেই সাথে কার সংগীত ভেসে আসে! এ…যে…কুণালের কণ্ঠস্বর! কুণাল? বিষাদে ভরা কুণাল এখানে? তা কি করে সম্ভব? তবু নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না, ছুটে যান দ্বারপ্রান্তে। দেখে আশ্বস্ত হন, সেখানে দাঁড়িয়ে এক অন্ধ ভিক্ষুক।

কি প্রলাপ বকে ভিক্ষুক! আমিই আপনার হতভাগ্য কুণাল। হতভাগ্য নিশ্চয়, পিতার মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারিনি, আমি অপরাধী! আপনার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি, কিন্তু দোষী ত জানল না কি তার অপরাধ, কি মহাপাপে আমি পাতকী, কি দোষে বিশ্বের সকল সুষমা দর্শনে আমি বঞ্চিত, জীবন হল অভিশাপে ভরা?

তিষ্যরক্ষিতার সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মহারাজ বললেন, উপযুক্ত শাস্তি পাবে চক্রান্তকারীরা। কুণাল জানায়, হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিকার? অত্যাচার দিয়ে অনাচার দূর? এতে মহত্ত্ব কোথায়, শান্তি কোথায়? একজন অপরাধ করেছে বলে আপনি অন্যায়ের বোঝা বাড়াবেন কেন?

মহারাজ এ কথা শুনে ছেলেকে আলিংগন করেন। বলেন, আমিই

যেন দৃষ্টিহারা হয়েছি, বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, তুমি আমায় দিয়েছ প্রকৃষ্ট পথের সন্ধান। আমি নিশ্চিত ফিরিয়ে আনব তোমার দৃষ্টিশক্তি, প্রয়োজন হলে আমার দৃষ্টি দিয়েও, না-হলে সান্ত্বনা নেই আমার জীবনে।

*　　　*　　　*

অন্ধ পুত্রকে নিয়ে ভিক্ষুকের বেশে চললেন প্রভু বুদ্ধের শরণে, উপস্থিত হলেন মহাবোধিব বৃক্ষমূলে। বুদ্ধগয়ার প্রধান ভিক্ষু তখন ঘোষা, তাঁর চরণ-উপান্তে শরণ নিলেন মহারাজ অশোক। অন্ধ পুত্রের দৃষ্টিদান তাঁকে করতেই হবে।

ঘোষা প্রার্থনা-সভার আহ্বান করলেন। এলো বিভিন্ন মঠের বৌদ্ধ-শ্রমণ, এলো ব্রাম্হণ, এলো দেশ-দেশান্তর থেকে অগণিত জনমানব। সবার সামনে দাঁড়িয়ে কুণাল বর্ণনা করেন সেই করুণ কাহিনী। সুললিত কণ্ঠে সেই বিষাদ গাথা উপস্থিত জনগণকে অভিভূত করে, দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তাঁর অন্ধ নয়নযুগল থেকে। উপস্থিত সকলের চোখেও দর দর ধারায় দেখা দেয় অশ্রু। বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ করেন সেই অশ্রু দিয়ে।

ঘোষা অঞ্জলিপুটে গ্রহণ করলেন অশ্রুজল, তারপর প্রার্থনায় বস্লেন। শেষে বুদ্ধকে স্মরণ করে বলেন—হে দেব, যদি সত্য হয় অন্তরের প্রার্থনা, যদি তোমার বাণী সত্য হয়, যদি অগণিত জনমানবের অশ্রু সত্য হয়, যদি স্নেহ, প্রেম, করুণা সত্য হয়, তবে হে পরম কারুণিক তথাগত, কুণালকে দৃষ্টিদান কর, তাকে আলো দাও, বিশ্বের সৌন্দর্য থেকে তাকে বঞ্চিত কর না! এই বলে তাঁর অঞ্জলিপুটের অশ্রুবিন্দু দিয়ে কুণালের চোখ ধুয়ে দিলেন। সানন্দে উপস্থিত সকলে দেখল, তথাগত মুখ তুলে চেয়েছেন, তাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে কুণাল, জগৎ আজ আলোয় আলো। প্রেমের অশ্রু বিশ্বকে করল কলুষমুক্ত।

পান্জাসাহেব

আজ পথে এক অভিনব জিনিষের সংগে পরিচয় হল, তাকে যন্ত্রদানবের মহামানবতা বলতে পারেন। ট্র্যাকটর দিয়ে চাষ-আবাদের আয়োজন চ'লেছে। যে চণ্ডীমণ্ডপে মা লক্ষীকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা হয়েছে, দেখে কল্পনাও করা যায় না, এই রুক্ষ পাহাড়ে কোন ক্রমে তাঁর আগমন সম্ভব। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, দু-দিন বাদে এখানে মা তাঁর সুনীল আঁচল বিছিয়ে দেবেন, দেখা দেবে সোনার ফসল। স্ফীতপ্লীহা-শোভিত আনাড়ির হাতে মাতৃবন্দনার ভার না দিয়ে, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষ্ণসখা হলধরের মত লোক যদি নিজ হাতে হাল ধরতেন, তা-হলে ভারতবাসীকে উন্ছো বৃত্তি গ্রহণ করতে হত না। বিশ্বের দরবারে ভিক্ষা-বৃত্তিই তার প্রধান কীর্তি হয়ে দাঁড়াত না।

যাঁর তত্ত্বাবধানে এই যন্ত্রদানবের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, তাঁর সংগে আলাপ-পরিচয় হল। তিনি জানালেন, পান্জাবের বুকে ট্র্যাকটর দিয়ে চাষ এই প্রথম। একে পরীক্ষামূলক কাজ বলতে পারেন। অবশ্য এর ফলাফল যে শুভ হবে, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

ভদ্রলোক বোধহয় বিজ্ঞান বলতে অজ্ঞান; তাই বলেন, আনবিক বোমা-পুষ্ট বিজ্ঞানকে ধ্বংসের ধ্বজাধারী আখ্যা দেই কিন্তু ভুলে যাই, নটরাজের তাণ্ডব মূর্তিই প্রকৃষ্ট রূপ নয়, সেই ভোলানাথের জটা থেকে অনন্ত ধারা এসে দেশটাকে সুজলা-সুফলা করেছে।

তিনি আরও বলেন—পান্জাবের সম্পদ তার নদী, কিন্তু তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে বিজ্ঞান। সময়-অসময় যা জল পাওয়া যায় সংগ্রহ করে রাখে, তারপর প্রয়োজন অনুসারে তাকে কাজে লাগায়। খাল কেটে দেশের সর্বত্র সে অমৃতধারা টেনে নিয়ে গিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, নদীর সমতা তারতম্য করে সৃষ্টি করেছে সহজলভ্য বৈদ্যুতিক শক্তি—হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার।

তাই ভারতের মত দরিদ্র দেশের এই অংগ আলোয় আলোকিত, এমন কি সুদূর পল্লীর মধ্যেও বিজলীর ঔজ্জ্বল্য নিজেকে সাড়ম্বরে প্রচার করেছে।

* * *

তখন রাত সাড়ে আটটা হবে, সাইকেল গেল বিগড়ে, বরাতে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? শ্রীবৎস রাজার ভাগ্যদোষে পোড়া শোল মাছেরও বোধহয় হাত-পা গজিয়েছিল, তাই তার পক্ষে নির্বিবাদে পালানো সম্ভব হয়েছিল; আবার কর্মফল শেষ হওয়ায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত পুত্র বেঁচে উঠেছিলেন, এমন নজীরও আছে। বুঝলাম, যতখানি হতাশায় ভেঙে পড়েছিলাম সে পরিমাণ স্নায়ুদৌর্বল্যগ্রস্ত না হলেও চলত। পান্‌জাসাহেবের পান্‌জার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের বাহন বিশ্রাম চাইছে। জায়গাটার আর এক নাম হাসান আবদাল। তবে এ হাসান হোসেনের তীর্থক্ষেত্র নয়, এখানে 'শিখ'রা খবরদারী করে।

জি টি রোডের কাছেই গুরদোয়ারা। আকার দেখেই তার আভিজাত্যের আভাস পাওয়া গেল, আবরণটাই যে আজকের দিনে গুণের মাপকাঠি। দরজার পাশে যে দু-জন দাঁড়িয়ে আছে মোটেই হাসছে না, যেন হাড়ির মত মুখ করে শ্রদ্ধা হাতাবার মতলবে আছে, তবু আমাদের পিত্ত না জ্বালিয়ে ছাড়ল না। যত বলি, ধূমপান আমাদের ধাতে সয় না; ওরা বলে, নিশ্চয় আছে, সেগুলো ওদের হাতে জমা না দিলে প্রবেশের অনুমতিপত্র মিলবে না। তাদের ধারণা ধূমপানে বাঙালীর খুব ধুমধাম। রিজিড কন্‌স্‌টিটিউশনেরও এমেণ্ডমেণ্ট হয়, অথচ ওদের ধারণা অজর-অমর। শেষে বলতে হয়, তাহলে অনুমতি কর, কিছু কিনে এনে জমা দিয়ে যাই।

ভেতরে ঢুকে গেলাম গুদাম ঘর, লেফ্‌ট লাগেজ এই পরিচয় দিলে বুঝবেন ভাল। আমাদের সম্পত্তি জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এতক্ষণে চোখ মেলে দেখবার সুযোগ হল। প্রতিষ্ঠানটি যে এত বড় হতে পারে তা ধারণাও করতে পারিনি। শুধু মন্দিরের কলেবরটা জমকালো নয়, উপস্থিত

অনুরক্তদের কলরবেও সদামুখরিত। প্রতিষ্ঠানটি যেন তীর্থযাত্রীর উত্তাল তরংগে জর্জরিত।

পর্যটক হলে একটা বৃত্তিতে সে টিকিধারীর ধাপে গিয়ে ওঠে, তা হল দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার। এখানে দরাজ হস্তেই তার ব্যবস্থা করা আছে। লম্বা সারি দিয়ে সবাই বসে গেছে, নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান। ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ এক সাথে বসে অন্নপানে ব্যস্ত। এ শুধু সাম্যবাদ নয়, co-এর প্রভাবযুক্ত। সামান্য ফাঁক পেয়ে তাকে পূর্ণাংগ করতে সাহায্য করলাম, গ্রন্থ সাহেবের মহিমায় প্রাপ্ত ডাল-রুটি সহযোগেআমাদেরও উদর পূর্ণ হল।

* * *

তীর্থযাত্রীদের সংগে সময় কাটান এক বিপদ। এ কোন বিশেষ ধর্মের বিধি নয়, এ বিষয়ে সকল ধর্ম সমান ফেরোশাস্। পূর্ব-পশ্চিমেরও বাদ-বিচার থাকে না। ধর্মগুরুর জীবনে দু-দশটা ঐন্দ্রজালিক কিছু যদি না ঘটে, সে কি করে মানুষের আরাধ্য দেবতা হবে! সত্য ঘটনা গতানুগতিক, তাতে রোমান্সের এসেন্স নেই, এসব কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। চমকপ্রদ কিছু ঘটনা বলুন, ধর্মপ্রাণ লোকেরা সগর্বে তা প্রচার করবে; সকলকে তা শুনে ভাবে গদ গদ হতে হবে, ভক্তিভরে আত্মনিবেদনে ব্যস্ত হতে হবে।

এখানকার ধর্মপ্রাণ শিখেরা যে বিশ্বাস নিয়ে গল্প শুরু করল, এদের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক খাড়া করার কথা চিন্তা করাও দায়। রোমারোঁলা বলেছিলেন, ফরাসীরা হল এক ধরণের এমিয়েবল্ ফ্যানাটিক, তারা কেবল শূন্যতাকে বিশ্বাস করে। আমার ধারণা, কোন ফরাসীকে এনে এই আব-হাওয়ায় বসিয়ে দিলে, রোমারোঁলাকেও তাঁর ধারণার পরিবর্তন করতে হত।

যীশু আসলে কি ছিলেন? একজন দাম্ভিক, হিটলারী মেজাজের লোক, তিনি লোককে গালমন্দও করেছেন। আর সমালোচক হলে কথাই

উঠত না, শ্লেষ না দিয়ে কথার শেষ করতেন না। একবার ফলের আশায় ডুমুর গাছের শরণ নিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় ব্যাচারা গাছটাকে শাপমন্নি করেন। তবু ধর্মের অনুশাসনে "তাঁর" সম্বন্ধে সমালোচনা করা পাপ। কৃষ্ণলীলাকে আমরা পবিত্রতা দিয়ে পূজো করতে পারি, সমালোচনা করার অধিকার নেই। নানকের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় ব্যতিক্রম থাকবে না।

বাবা নানকের আমাদের মত কিছুটা যাযাবরী বৃত্তি ছিল। দিনের বা ক্ষণের বাদ-বিচার থাকত না, চলেছেন ত চলেছেন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে গ্রীষ্মের এক ভরা দুপুরে, দুই শিষ্য, বালা আর মর্দানাকে নিয়ে হাজির হলেন এখানে। তাঁরা সকলে অশেষ পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণায় ব্যাকুল। পাহাড়ের অপর প্রান্তে বইছে ঝর্ণার সুশীতল জল। এক শিষ্য গেল জল সংগ্রহে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা লগুড় হস্তে সম্বর্ধনা জানাল, বিধর্মীকে তারা জল দেবে না। শিষ্য হতাশ হয়ে ফিরে এল। গুরু নানক আবার পাঠালেন তাকে। তিন তিনবার তাঁর বিনীত নিবেদন ব্যর্থ হল। তখন তিনি হাতের চাপে পাহাড়ের গা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দিলেন, জলধারা দিক পরিবর্তন করল, চলে এল সেখানে।

ভাবছিলাম, কাজটা কি তাঁর ঠিক হয়েছিল। কোন ধর্মগুরুর সামান্য কারণে এতখানি উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না। শক্তি আছে বলেই যেখানে সেখানে তার অপব্যবহার করতে হবে, এ খুব ভাল কথা নয়। যীশুর সামান্য মাত্র ইংগিত পেলে এক কোটি বিশ লক্ষ দেবসেনা তাঁকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত ছিল, বন্দী অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ হবার কালেও তিনি কারও সাহায্য রিকুইজিশন করেননি। তবে কেউ কেউ অবশ্য বলেন, যীশুর এ কাজ ভীরুতা দোষে দুষ্ট। মহম্মদকে এমন ভাবে আত্মদান করতে বললে, নিশ্চিত তিনি তেড়ে আসতেন; বলতেন, আত্মরক্ষাই সব থেকে বড় ধর্ম। তাই ত তিনি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে

অস্ত্র ধারণ করেছেন, আবার যখন দেখেছেন গতিক সুবিধের নয়, বীরত্বের সংগে পশ্চাৎ অপসরণ করতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হননি।

বুঝলাম, ধর্ম-অধর্মের জাতি বিচার করা বা মহত্বের মান নির্ণয় করা, দুই সমান দুরূহ ব্যাপার!

আরও এক দুর্ভোগ, তীর্থক্ষেত্রে বসে ধর্মগুরুর সম্বন্ধে অতি মাত্রায় মহিমা-কীর্তন না শুনলে নিষ্কৃতি দেবে না। এখানকার শিখেরা দেখায়, ঝর্ণার উৎপত্তি স্থানে রয়েছে গুরু নানকের পান্‌জার ছাপ—গুরুর ভক্তিতে পাষাণও বিগলিত হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা অতখানি ভক্তিময় নয়, তাই কেবল সেই পান্‌জায় নিজের পান্‌জা মিলিয়ে নিয়ে, তাকে ক্ষয় করার চেষ্টায় আছে। অতঃপর সেই পবিত্রীকৃত পান্‌জা দেহের সর্বাংগে স্পর্শ করছে, আর সেই ঝর্ণার জল পান করছে অমৃত জ্ঞানে।

বংকিমচন্দ্র গভীর দুঃখে বলেছিলেন, হায় লাঠি তোমার দিন গিয়েছে; অন্তরের বেদনা নিয়ে জানালাম, হায় অসি তোমার ইস্‌পাতে মরচে ধরেছে, তুমি এখন অকর্মণ্য। কবিগুরুর দূরদৃষ্টিও সফল হল না। শিখদের অস্ত্র আর বস্ত্র সজ্জাই সার হল, তার বেশী গড়াল না। কে আগে প্রাণ দেবে তার জন্যে আজ কাড়াকাড়ি নেই, কে তাড়াতাড়ি পান্‌জা মিলিয়ে পুণ্য-সঞ্চয়ের থলি পূর্ণ করবে তাতেই ব্যস্ত।

* * *

পান্‌জার কাছেই জলস্রোতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দু-পাশে চলে গেছে মেয়েদের নাইবার ঘরে, সামনে পুরুষদের। এই জলস্রোত দিয়ে গুরদোয়ারার চতুর্দিক ঘেরা। সে ঝর্ণার জল শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, সুশীতলও বটে। তবে শীতলতার মাত্রা তখনও বুঝিনি, নাইতে নেমে মনে হয়েছিল, বুঝি বা বরফের স্তূপের মধ্যে ডুবিয়ে কেউ সাজা দিচ্ছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, বড় বড় মাছ এসে পায়ে কামড় দিতে শুরু করে।

বিরাট পরিধি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান। সীমানা নির্দেশ করা দোতলা বাড়ী

দিয়ে, সেগুলো যাত্রীনিবাসের কাজ করে। এর সংখ্যাধিক্য দেখে ভেবেছিলাম, এত বাড়াবাড়ি করা অনর্থক; আশ্রয়ের সন্ধানে গিয়ে উপলব্ধি করলাম, যাত্রীর তুলনায় এ বুঝি বা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য। তাই মর্যাদাসম্পন্ন সংখ্যক যাত্রীকে রাত্রি যাপন করতে হয় মন্দিরের উন্মুক্ত চত্বরে। সাক্ষাৎ মায়ের বুকে শোবার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও দেখি, কেউ চেটাই পেতে নিদ্রা যাচ্ছে, কেউ বা তারই পাশে রাজশয্যা পেতেছে। অবশ্য একদল স্বর্গ আমার দেশের মাটি, কবিতাকে বাস্তবে অনুশীলন করেছে। কবিগুরু আমাদের ঘরের লোক, আমরা যে তাঁর ভক্ত হব, তাতে আশ্চর্যের কি ?

* * *

ঘড়ির সংকেত ধ্বনিতে সতর্ক হবার প্রয়োজন হয় না, ভোর না হতেই বৈদ্যুতিক শব্দবিকীরণ-যন্ত্র গুরু-গম্ভীর নিনাদ করে ওঠে, শুরু হয় স্তোত্র পাঠ। ঊষার স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় সুললিত কণ্ঠের গাম্ভীর্যপূর্ণ দেবপ্রশস্তি মনকে নিয়ে যায় বহু দূরে, কোন পবিত্র দেবলোকে। পরবর্তী আকর্ষণ সংগীত-সাধনা, পূজায় তার পরিসমাপ্তি।

মুহূর্তের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল, দামামা বেজে উঠল ভীম-ভয়ংকর রব করে, এই কর্ণপটাহ-বিদারক বজ্রনিনাদ লোকের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে, সে কিন্তু ভক্তির উদ্রেক করে কথা ভাবতে পারি না। শব্দ-সংকেতের সংগে সংগে যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে উঠল, আমরাও পলক ফেলার অবসর না দিয়ে তাদের পদাংক অনুসরণ করলাম।

পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট হলেও কথাটা না জানালে মনে শান্তি পাব না। পর্যটক আখ্যা পেলেই যে তামসিক প্রবৃত্তিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেটা উদর মহাপ্রভুর অনুগ্রহের দান। আবার যারা সাইকেল ভরসা করে যাত্রা করে, তাদের জঠরানল রাবণের চিতার মত সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকে, বিনা প্রয়োজনেই খাণ্ডব দাহন হতে থাকে অবাধ গতিতে।

যাদের অবদানে তাকে শান্ত করা যায়, এমন কোন প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি

পেলাম না, তাই ভোজনপর্ব শুরু হবার আগেই কিছু পাবার আশায় গুরদ্বোয়ারার লংগরখানায় গেলাম। কিন্তু হিতে বিপরীত, ভীম-ভবানীরও বাড়া বপু নিয়ে এক সর্দার পিঠ চাপড়ে দেয়, যেন ছোট ছেলেকে আদর করছে; তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে কাজে জুড়ে দেয়, হুকুম করে আসনগুলো বিছিয়ে দিতে। অবশ্য এতে অপমানের কিছু নেই বরং পুণ্য-সঞ্চয়ের সুযোগ পেলাম বলে অনেকে আমাদের ওপর ঈর্ষান্বিত হল।

সকাল দশটায় পাত পড়তে শুরু হয়, রাত দশটায় পাটা বন্ধ। নিত্যকার এই দশাশ্বমেধ-যজ্ঞে পারিশ্রমিক দিয়ে লোক নিয়োগ করতে হলে, বাজেট সংকুলান করা এক বিষম দায় হত।

আপনাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, এর পেছনে কোন গৌরী সেন আছেন কি না? জেনে রাখুন, তার প্রয়োজন অনুভূত হয় না, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কৃতিত্ব অর্জন করার মত সৎপ্রবৃত্তি সবার নেই, বিশেষ করে ধর্মক্ষেত্রে পরগাছা হবার বাসনা, পুণ্যকামী যাত্রীদের কল্পনার অতীত। তাই দু-টাকা খরচ করালে পাঁচটাকা দিয়ে যায় মন্দিরের তহবিলে।

এবার সহর প্রদক্ষিণে বেরোলাম। দর্শনীয় কিছু পেলাম না। দেখতে পেলাম, সেই গতানুগতিক ছেলে ভোলান খেলনা, সাবান-তরলআলতা, মাথার কিলিপ-কাঁটা; বড়জোর মিলতে পারে সিঁথির-সিঁদুর-অক্ষয়-হোক বা পতি-পরম-গুরু মার্কা দেওয়া দু-দশটা জিনিষ।

* * *

এক দোকানে সাইকেলের সদ্‌গতি করতে দিলাম। কাছেই এক ভদ্রলোকের দর্শন পেলাম, যাঁর হাতে একখানি হিন্দী দৈনিক। বহু দিন বাদে বিশ্ব-জগতের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে ঝুঁকে পড়লাম। এই অসৌজন্যে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁর মুখে, বন্ধুও......। মোটমাট একটা দৃশ্যের অবতারণা হল। কিন্তু তার সর্বশেষ পরিণতি, আমরা অত্যন্ত

প্রীত হলাম তাঁর দর্শন লাভ করে, তিনিও অশেষ আনন্দিত হলেন আমাদের সংগে পরিচিত হয়ে।

কথা প্রসংগে প্রথমেই মাথা তোলে সাম্প্রদায়িক দাংগা, সে বিষয়ে মত ও পথের চূড়ান্ত বিচার হবার আগেই অন্যান্য কথা এসে পড়ে—লৌহ-যবনিকা ভেদ করে দু-পক্ষ হাতে হাত মেলাতে পারবে কি? ভারত সত্যি স্বাধীনতা পাবে? যদি কংগ্রেসের সংগ্রাম সোনার ডিম প্রসব করে, মিঃ জিন্না এসে সিংহের ভাগ দাবী করবে না ত?

বৈঠকখানার আলোচনা শেষ হয় নিম্মি আর সুরাইয়ায়, ধর্মক্ষেত্রে এলে শেষপর্যন্ত সঞ্জয় এসে হাল ধরেন। চলল ধর্ম আলোচনা, এই যে আকালীদের দেখছেন, নীল রঙের পোষাক, হাতে তামার বা[illegible] দেখতে বৈরাগী বৈরাগী ভাব, এরা খুব নিষ্ঠাবান শিষ্য। এরা ধর্মানু-শাসনের যেন জীবন্ত বিধান, পান থেকে চূণ খসতে দেবে না। জীবনের ভোগবিলাস এরা ত্যাগ করেছে, ভিক্ষা করে যা খুদ-কুঁড়ো পায় তাই দিয়ে জীবন কাটায়। আবার প্রয়োজন হলেই আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসে, প্রাণ দিয়েও ধর্মের মান রক্ষা করবে। এদের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিও খুব, মিশলের পাণ্ডারা পর্যন্ত এদের ভয়ে জড়সড়।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি—মিশল কি অনেকটা বৈষ্ণবসভা গোছের?

—মিশল কি জানেন না?

যেন মস্ত অপরাধ করেছি, আমার ভ্রমণটাই বৃথা হয়েছে, এখনও সবার সহানুভূতির পাত্র।

তিনি সাড়ম্বরে তাঁর অভিভাষণ শুরু করেন, শেষ গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর বান্দা নিলেন নেতৃত্বের ভার, টলটলায়মান অবস্থায় নেতৃত্বের তরী তবু চলেছিল কোন রকমে, তাঁর মৃত্যুর পর হাল ধরার কেউ থাকল না। সুযোগ বুঝে মুসলমানরাও বাড়াল অত্যাচারের মাত্রা।

প্রাণের দায়ে ষণ্ডামার্কা লোককে পাণ্ডা করে ছোট ছোট দল গড়ে

ওঠে। তাদের মধ্যে অনেকে বেশ শক্তিশালী হয়, আধিপত্য করে পাশাপাশি দু-দশটা গ্রামে। এই দলগুলির নাম মিশল, পাণ্ডারা আখ্যা পেল সর্দার। আর এই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মূলনীতি হল, শত্রুপক্ষের সম্পত্তিকে আত্মনেপদী করা।

মিশলের শাসনতন্ত্রে সর্দারজী ছিলেন, দি গ্রেট ডিক্‌টেটর। তবে বিলি-ব্যবস্থা ছিল প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ, লুণ্ঠিত সম্পদের সবাই পাবে সমান ভাগ। বার্ডস অফ দি সেম ফেদার হিসেবে দলে দলে মিশ খেয়ে যেত। সর্তের কোন মার-প্যাঁচ নেই, প্রপার্টি ভাজক টোটাল স্ট্রেঙ্‌থ।

অবশ্য এক দলের সংগে অন্য দলের যে ইটটা পাটকেলটা চলত না তা নয়, বরং তা প্রায় গা সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে কোন প্রবল পরাক্রান্ত ফরেন এলিমেণ্ট যখন দ্বারে ঘা দিত, তাদের ঐকাতান ধ্বনিত হয়ে উঠত। তখন গলায় গলায় বন্ধুত্ব, শত্রুপক্ষকে গলাধাক্কা না দিতে পারলে তাদের ছাড়াছাড়ি হবার কোন সম্ভাবনা থাকত না। সর্বমিশলীয় মিলন-কেন্দ্র ছিল অমৃতসর, সেখানে বসত জাতীয় মহাসভা, চেষ্টা চলত দেশের বিধিলিপি অদল-বদলের।

শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে বিচার করলে, দশ বারোটা মিশলকে অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। প্রধান দলটির নাম ছিল, ভাংগী—ভাঙ্‌ সেবনে তারা ছিল বিশেষ দক্ষ। মুন্না সিংহ ও জগৎ সিংহ এই দলটি গড়েন। জগৎ সিংহের ভাঙের প্রয়োজন হত নাকি মণ হিসেবে, তাই এই নামকরণ। এ সব শুনে ঠোঁট ওল্টাবেন না, সংখ্যাতত্ত্ব শুনলেই শ্রদ্ধায় গদ গদ হতে হবে, তাদের শুধু অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার।

দ্বিতীয় দল নিশানী—খালসা সৈন্যবাহিনীর পতাকা বাহকদের নিয়ে দলটি গড়ে ওঠে। তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি,

এ প্রার্থনা সর্দারজী নিশ্চয় মন খুলে গুরুপদে নিবেদন করেননি, বোধহয় সেই কারণে দলটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

তৃতীয়, ঘুনিয়া বা কুণিয়া। সুদাকৌঁড়ের নাম শুনেছেন ত? রণজিৎ সিংহের শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী। যাঁর বুদ্ধিবল, জনবল ও ধনবলের ওপর খুঁটি গেড়ে তিনি পান্‌জাব-কেশরীর সৌধ রচনা করেন। মনান্তর হওয়ায় বৃদ্ধ বয়েসে ধুরন্ধর জামাতার বিরুদ্ধে তিনি ঝাণ্ডা উঁচিয়ে শক্তি পরীক্ষায় অবতরণ করেন: এই মিশলকে সে মহিয়সী মহিলা শক্তিশালী করেছিলেন।

আরও দল আছে, আলুওয়ালিয়া, সুকিয়া, ফইজলপুরিয়া, রামঘোরিয়া……

বলি—তার চেয়ে একটা বায়রণের কবিতা শুনুন,

সোসাইটি ইস নাউ ওয়ান পলিশ্‌ড হোর্ড
ফর্মড অফ টু মাইটি ট্রাইব্‌স্‌,
দি বোর্স এণ্ড দি বোর্ড।

এটক

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম পান্‌জাসাহেব ছেড়ে। আজকের আবহাওয়া চমৎকার। সূর্যদেব বহু দিন লগুড় নিয়ে তাড়া করেছেন, আজ বাৎসল্য দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাও মনের আনন্দে পাহাড়ের পর পাহাড় অবহেলা করে এগিয়ে চলেছিলাম। পথের ধারেই বিরাট দুর্গ। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে জগন্মাতার নাম দুর্গা হয়েছিল কিনা জানি না, তবে এখানকার কর্ত্রী শুধু দুর্গতিনাশিনী নয় আনন্দদায়িনীও বটে।

বিদ্যুৎ প্রবাহে ঝলমলিয়ে উঠেছে দুর্গের চতুর্দিক। বেতারের নীরস বার্তা শুনতে এরা মোটেই রাজি নয়, খালি তারস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে মধুছন্দে গীত

বামাম্বর, তা-ছাড়া এখানে ওখানে চলেছে নৃত্যগীত। একে জীবনের পূর্ণ রূপ বললেও ছোট করা হয়, এ হল জীবনের অ্যাম্প্লিফায়ার।

দুর্গের প্রধান অংগটি পাহাড়ের চূড়ায়, তার পরই সোজা নেমে গেছে খরস্রোতা সিন্ধু নদীতে। এমন স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়ও স্বেদবিন্দু দেখা দিল, তা পরিশ্রমের ফসল নয়, চিন্তার মুকুল—পথ আটকে দিল এটক ব্রিজ। শুধু কি তাই, রাইফেলধারী রক্ষী হু-ইস্-দেয়ার বলে এমন হাঁক ছাড়ল, যে পিলে চমকে যাবার উপক্রম। এই কি বন্ধুত্বপূর্ণ আবাহন!

বিধি বাম, বিধান আছে সন্ধ্যে হলে ব্রিজ দিয়ে পারাপার বন্ধ। হরি হে দীনবন্ধু, বলে পার হবার প্রার্থনা জানালেও সুযোগ মেলার সম্ভাবনা নেই, আবার কাছাকাছি কোন গ্রামও ত নজরে পড়েনি।

বললাম—আমরা চোর ডাকাত নই, পঞ্চম কলমও নই, দাও না ছেড়ে, টুক করে পেরিয়ে যাই।

বলে—আমাদেরও দায়িত্ব আছে। রাত-বিরেতে পাঠানমুল্লুকে ছেড়ে দেই, শেষে সাক্ষাৎ যমের দরজায় ধাক্কা দিতে থাক।

একেবারে নির্দয় তাদের বলি কি করে? সংগী দিল গ্রামে পৌঁছে দিতে। আরও বলে দিল, গ্রামের সর্দার হলেন নুর সাহেব, তাঁর পলিত কেশ, তবে দাঁত পড়েনি একটাও খুব সাবধানে কথা কইবে।

তাদের উপদেশামৃত শিরোধার্য করে নুর সাহেবের দরগায় পৌঁছলাম। বয়েসে সেন্টেনারী উৎসব পালন করার উপযুক্ত, লম্বা-চওড়া গড়ন, নারদ-মুনি-মার্কা অল হোয়াইট দাড়ি এবং চুল। জানালাম, যথাবিহিত সম্মান পুরঃসরং নিবেদনম্ ইদম্।

পরিচয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। কিন্তু অন্তরের আদান-প্রদান করার মত আসর জমল না। শেষে তিনি আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপরই জানালেন, আমাদের সেবার কি ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব?

—বেহায়ার মত বলতে গেলে অবশ্য আলাদা কথা, তবে যখন আপনাদের কাছে অত্মসমর্পণ করেছি, আপনারা যা বিধি-ব্যবস্থা করেন তাই সশ্রদ্ধায় মেনে নেব।

—ধর্ম এসে শ্রদ্ধার মাঝে প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে পারে—দেশাচারের ওপর ভিত্তি করেই সমাজধর্ম, সুতবাং সে ধবণের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা অস্বাভাবিক বা অসংগত নয়। ভেবে দেখুন, শেষে ভোজন করে সমাজের অভাজন হবেন না ত ?

বুঝলাম হাই লেভেল কথাবার্তা চালাতে চান, তাতেও সুশোভন ডিপ্লমেসির আবরণ, সবাসরি জিজ্ঞাসা করতে বেধেছে, তাই নাম শুনে ধরেছেন আমরা হিন্দু, এখন পরোক্ষভাবে মতামত জানতে চান। আমরা অত ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে যেতে চাই না, জানাই—যদি উপোস করিয়ে রাখার দুরভিসন্ধি মনে মনে এঁটে থাকেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন অসম্মতি নেই, তবে অবুঝ উদর মহাপ্রভু ঘোর আপত্তি তুললে, এই অভাগাদের অপরাধী করবেন না।

মনের মেঘ উড়ে গেল। তিনি উঠে এসে আবার করমর্দন করলেন, মুখে যেন কিসের বিজয়গর্ব। তারপর আমাদের গল্পের মজলিশি আসর জমজমাট হয়ে উঠল। আমরা সালংকারে বর্ণনা করি আমাদের বীরত্ব-গাথা। পরে বুঝলাম, দু-দিনের বৈরাগ্যে ঝাঁজ বেশী। যিনি সাগ্রহে শুনছিলেন কথাগুলো, সেই মুর সাহেব পৃথিবীর বহু দেশের সংগে পরিচিত ছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই খাবার এল, বেতের তৈরী বাসনে ফরসা তোয়ালে ঢাকা। অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেখি, দু-খানা করে রুটি আর লংকার আচার। সংখ্যাল্পতা দেখে ওদের ঔদার্য সম্বন্ধে কোন কঠোর মন্তব্য করে বসবেন না। সসিদ্ধ নাড়ী নিয়েও একখানার বেশী খেতে পারিনি।

বিশ্বের অদ্বিতীয় আশ্চর্যের আবরণ উন্মোচিত হল। কিছুক্ষণ বাদে এক হিন্দু যুবক, তার মা ও অবিবাহিত যুবতী বোনকে নিয়ে হাজির হলেন

সেখানে। তাঁরাও তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন, ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে তাই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এসেছেন এখানে। বলা বাহুল্য, মুর সাহেবের বাড়ী রাতের মত পেলেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আজ সে-কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে—বাঘের কাছে ছাগল পোষাণী, ইলেকট্রো ম্যাগনেটের সামনে সফ্‌ট আয়রণ—একেবারে অবাস্তব ; এ নিশ্চয় কোন গোঁড়া আদর্শবাদীর সাজান গল্প, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মিথ্যা প্রোপাগ্যাণ্ডা ! আজ যে আমাদের আত্মমর্যাদা স্বীকৃতি পেয়েছে, কপালে তিলক পরেছি টু-নেশনের !

দেবগণকে স্বর্গরাজ্য থেকে বিচ্যুত করেছিলেন শুম্ভ এবং নিশুম্ভ। সে পাপের শাস্তি-বিধানে উঠে পড়ে লাগলেন সৃষ্টিকর্তারা, ঘন ঘন বসল ডিপ্লমেটিক কন্‌ফারেন্স। ক্রমে জন্ম নিল অপরূপ সুন্দরী তিলোত্তমা, নাবালিকা বয়েসেই সেই দেবকন্যাকে যেতে হল বিপজ্জনক শত্রুপক্ষের এলাকায়। শুম্ভ-নিশুম্ভ উভয়েই হল তার প্রেমে পাগল, দু-জনেই তার পতিত্বের না হলেও একাধিপত্যের দাবী জানায়। ফলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেও নিষ্কৃতি ছিল, কিন্তু দেবগণ জানতেন বীরশ্রেষ্ঠদের বিরোধ বাক্য-বিনিময়ে নিষ্পত্তি হয় না। দেবগণের উপদেষ্টা কমিটিতে কোন ইংগ-জাতীয় শ্বেতাংগ ছিলেন এমন নজীর পাওয়া যায় না, কিন্তু সে কূটনৈতিক চালে সৃষ্টি হল বিভেদ—অজেয় শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত হল পরস্পরের অস্ত্রে।

যদুকুলের অপরাধ, নারদ, কণ্ব ও বিশ্বামিত্র মুনিকে দিয়ে কিছু হাস্যরস পরিবেশন করার আয়োজন করে। আসন্ন সন্তানসম্ভবাকে দেখিয়ে জানতে চায় গর্ভস্থিত সন্তানের পরিচয়, আসলে সে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ-তনয় শাম্ব। মুনিগণের বরে অসম্ভব সম্ভব হল ; সে প্রসব করল, কিন্তু তা সন্তান নয় মুষল এবং তার পরিচয়, মুষলং কুলনাশনং। যদুকুলতিলক কৃষ্ণের কূটনীতিও ব্যর্থ হল। পাথরে ঘসে ঘসে মুষলের ক্ষয় হল, কিন্তু নদীর জলে ভেসে পরপারে গড়ল শরগাছ।

মুনিবররা উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন, প্রভাস নদীর বেলা ভূমিতে বন-ভোজনের মাঝে ভাঙন ধরল নিজেদের মধ্যে, হাতাহাতির পর লাঠালাঠি—সেই শরের আঘাতে ধ্বংস হল যদুকুল।

ভাবছিলাম, ভারতবাসীরা কি অপরাধ করল? ইংরাজের পাকা ধানে মই দেবার বাসনা তাদের কোন দিন ছিল না। আমরা ত জানি, চিরকাল সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেলাম ঠুকেছে, সম্বোধন করেছে পরম শ্রদ্ধেয় সাহেব উপাধিতে; সবাইকে নাইটের পর্যায়ে তুলে অগণিত স্যাব বলেছে, হয়ত বা প্রয়োজনীয় কথার সংখ্যা থেকে স্যারের সংখ্যা বেশী দিয়েছে; চিঠি লিখলে আই হ্যাভ দি অনার থেকে শুরু করে মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট, সব কিছু জুড়ে দিয়েছে; তবু বুঝি না, কেন তারা ভারতবাসীর ওপর এতখানি শত্রুতা করেছে, এক জনকে ক্ষেপিয়েছে অপর জনের বিরুদ্ধে—মোটমাট দেশটাকে ধ্বংস করার ব্রত নিয়েছে, শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীকে জাহান্নামে পাঠাবার পথ করেছে প্রশস্ত।

* * * *

গ্রামটা পাহাড়ের বুকে তাই উত্তাপ কম। পাশেই পার্বত্য নদীর গতিবেগ নিয়ে বিরাজিত সিন্ধু নদী। তার মিষ্টি হাওয়ার আমেজ লাগে মনে, শুধু চারপাই নয় কম্বলও জুটেছে; শোবার সবুর সইল না, বোধহয় তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে দেখি খাট থেকে পড়ে গেছি, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে চলেছি, পাথরের ধারালো উঁচু উঁচু মাথাগুলোয় আঘাত লেগে সর্বাংগ ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, অথচ এমন ক্ষমতা নেই যে নিজেকে রোধ করি, বা একটা পাথর আঁকাড়ে ধরি। ওঃ কি যন্ত্রণা, কি অসহায় অবস্থা! শেষে গড়িয়ে গড়িয়ে কি সিন্ধুনদীতে সমাধি লাভ করব?…বন্ধুর ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল, কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। দেখি চারপাই-এর ওপরই শুয়ে আছি, আমাদের ওপরে হু-হু শব্দে ঝড় বইছে, আর শীতের

প্রবলতায় কাঁপছি ঠক্ ঠক্ করে। বিপদে পড়লে আপনি বুদ্ধি খুলে যায়, কম্বলটি ধরে একবার পাক খেয়ে নিলাম। কম্বলের এখন ডুয়াল পার-সোনালিটি একাধারে লেপ ও তোষক। যাক ক্ষত-বিক্ষত হবার ভয়ে দ্বিতীয় বার নিশ্চয় বন্ধুর নিদ্রার ব্যাঘাত করব না।

বলতে ভুল হয়ে গেছে, গ্রামটার নাম মালাইটোলা অর্থাৎ মাঝিদের গ্রাম। বাদশা আকবর এক সুসংবদ্ধ নৌবাহিনী গঠন করেন। জলপথে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, নাবিকদের পরিবাররা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে তাই খয়রাৎ করলেন গ্রামটা। নাবিক-বংশধরেরা পূর্বপুরুষের বৃত্তি শিকেয় তুলে দিয়েছে অনেক দিন, কেবল নামের সংগেই যেন ওদের প্রাণের টান।

সকালে উঠে নুর সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। ছোট ঘর, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুধু তাই নয় ঘরটিকে মাঝারি গোছের লাইব্রেরী বলা যায়। বিদ্যাদেবীর সাধনা আর দেব আরাধনা নিয়ে তাঁর জীবন। তিনি দু-এক দিন থেকে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু পথের দিকে মন টেনেছে, তাই সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হল না।

* * *

যখন করণীয় কিছু থাকে না মানুষ চিন্তা করে, আমিও সে ধর্মে পতিত নই। বিষয়বস্তু ও গুরুত্বের ওপর চিন্তার মান নির্ভর করে, তার আপার লিমিটে জ্ঞানগর্ভ, লোয়ার লিমিটে আবোল তাবোল, আমার চিন্তাধারা সাইন অফ ইন্টিগ্রেশন টানলে একটু ঠাঁই পাবেই, বাস্তুহারা হবার বিড়ম্বনা নিশ্চয় সইতে হবে না।

নুর সাহেবের দরবার বসেছে, সেখানে এল হিন্দু তীর্থযাত্রী, সংগে অবিবাহিত সুন্দরী তরুণী, রাতের মত এইটেই তাদের নিরাপদ আশ্রয়। সেই পান্‌জাব আর আজকের পান্‌জাব? দু-দিন আগে যা ছিল অতি সাধারণ ঘটনা, আজ তা কল্পনার চোখে দেখাও সম্ভব নয়, সে কথা ভাবতেও আজ গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যে আজ স্বাধীন!

স্বাদেশিকতার সাগর ছেঁচে উঠল এক পরমপুরুষ, তিনি হলেন আমাদের চির-আরাধ্য স্বাধীনতা—তার ডান হাতে সুধাপাত্র, বাম করে বিষভাণ্ড—সে সুধা নাকি ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ, জনসাধারণের প্রাপ্য শেষোক্তটি। বিষক্রিয়ার ফল প্রথম দেখা দিল ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে, অগণিত মানুষকে দিতে হল আত্মাহুতি; অবশিষ্ট একদলকে ইহুদী হয়ে ফিরতে হচ্ছে পথে পথে, জানে না কোথায় এবং কবে পাবে সামাজিক মানুষের মত বাঁচবার অধিকার!

মুর সাহেব হয়ত আজও আছেন, কিন্তু কোন হিন্দু ষ্টেট প্রটেকশন পেলেও যেতে চাইবে না তাঁর ত্রিসীমানায়। শিখদের রাজত্ব সেই পান্জাবের বৃহত্তর অংগে আজ কোন শিখ গিয়ে পড়লে, সে দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তাকে ঘিরে ব্যস্ত থাকে একটা ছোটখাট মিলিটারি স্কোয়াড্রন। অথচ দু-দিন আগে তারা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করেছে, পরস্পর পরস্পরের দুঃখে কাতর হয়েছে, একের বিপদে অন্যজন মাথা দিয়েছে।

রাতারাতি আমরা প্রগ্রেসিভ হয়েছি, গালভরা ধ্বনি তুলেছি, ব্লাড ফর ব্লাড, করেংগে ইয়ে মরেংগে। আমরা বুদ্ধ নই গান্ধীজীও নই, তাদের আদর্শবাদকে আমরা পরোয়া করি না। কিছু করতে না পারলেও আত্ম-হত্যা করতে পারি, অন্য দু-দশ জনকে হত্যা করতে পারি। এসিডের আধিপত্যকে মোচড় দিতে হলে এলকালি ছাড়া উপায় কি? দুই যদি করোসিভ হয়, সেই আশংকায় চুপ করে বসে থাকা যায় না।

আর ঝড়-ঝন্ঝা না থাকলে সে ত জীবনই নয়; এই বিগ্রহ আর যুদ্ধ নিয়েই পৃথিবীর মহাকাব্য। হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি, পুণ্য ভারত-ভূমির রামায়ণ মহাভারত, মিল্টনের স্বর্গহারা, সর্বত্রই সেই মনোবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। সে-দিন না হয় পঞ্চনদীর তীরে বসে নির্ভীক শিখেরা বেণীর সংগে শির দিয়েছে, আজ আড়াইখানা নদীর তীরে বসে দাড়ি বানাবে।

আর একটা কথা বলি, অবান্তর হলেও অবহেলা করার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তবু তাঁর 'তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা', এ বন্দনায় বিশ্বজনীনতা পাওয়া যায় না, এ যেন সীমাবদ্ধ, এতে আছে সংকীর্ণতা। বিশ্ব আরও এগিয়ে যেতে চায়, আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে চায়; তাই বলে—ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান নেশন, তাই গড়েছে বিশ্বসংস্থা—ইউনাইটেড নেশনস। মানুষ তার অন্তরের দুর্বলতাকে ঘিরে কড়া পাহারা বসিয়েছে, তারস্বরে বিপরীত প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা খাড়া করেছে। তার সম্মিলিত জাতিসংঘ গড়ার প্রয়াস, তার বিশ্বঐক্য দুন্দুভিনাদের কারণ, মানুষ পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, গণ্ডীকে ভাষা দিয়ে, জাতি দিয়ে, ধর্ম এবং বর্ণ দিয়ে ছোট করতে চায়।

কোন দ্রব্যকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা যায়, একেবারে বিন্দুতে পরিণত করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে তার কোন সম্মান নেই; বলে, ক্ষুদ্র আরও ক্ষুদ্র, আরও—আরও; দেখা যাবে না, অনুভব করা যাবে না, কেবল জানার জন্যে জানা, বিচারের জন্যে সিদ্ধান্ত—তার নাম মলিকিউল বা অণু। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হল, এল অ্যাটম বা পরমাণু। তাকেও ভাঙল, সৃষ্টি করল প্রচণ্ড শক্তি। এই বিজ্ঞানের বিজয়রথে চড়েছেন রাজনীতি-বিদেরা, তাই পৃথিবীর সর্বত্র আজ চলেছে এই ভাঙাভাঙি, এই বিচ্ছিন্নতা, এই শক্তির প্রকাশ—এতেই মানুষের আনন্দ!

কয়েক বছর আগেও পান্‌জাব ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও দিল্লীর সমন্বয়ে, সাতটা নদী দিয়ে ঘেরা। একটি কলমের আঁচড়ে পাঁচটা নদী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। র‍্যাডক্লিফ দিলেন শেষ প্রলেপ, তাই আজ আড়াইখানা নদী নিয়ে পান্‌জাব, কেবল নামের শেষে বন্ধনীর মধ্যে 'আই' এবং 'পি' বসালেই যথেষ্ট। ক্রেসেণ্ট এণ্ড ষ্টার, চন্দ্রকলা আর তারা যখন এটুকু করতে পারে, আগামী কালে কোন মাষ্টার তারা, না এক নদী নিয়ে গড়া পান্‌জাবে গেয়ে ওঠেন, পঞ্চনদীর তীরে।

সুদূর অতীতে সেই বৈদিক যুগে ঋষিরা এই ভূখণ্ডের নাম দিয়েছিলেন

সপ্তসিন্ধু—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা এই পঞ্চনদী, এপারে যমুনা ওপারে সিন্ধু। এই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠে সিন্ধু-সভ্যতা, দেখা দেয় জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ ভারত।

গ্রীক ভাষায় হিন্দ্ শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। ভারতবাসীরা গ্রীক অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলেই তারা এই বিশেষণে ভূষিত করে। তাদের অনুকরণে রোমান ইতিহাসও নাম দিল হিন্দ্ বা ইন্দ্। আরবেরা সেই অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি দিয়ে হোক বা হিন্দী অর্থাৎ প্রিয় এই ভাবার্থে নাম দিল হিন্দ্—যার থেকে হিন্দু-সভ্যতা নামান্তরে সিন্ধু-সভ্যতা।

কৃষ্ণবর্ণে শ্বেতকায় জাতির ঘোর বিতৃষ্ণা। তাই তাকে নির্মূল করার জন্যে বহু জাত এসেছে ভারতের বুকে; তারা ভয় দেখিয়েছে, যুদ্ধযাত্রা করেছে,অনেক ক্ষেত্রে পরাজিতও করেছে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণকে নির্মূল করতে পারেনি; বরং নিজেরাই মিশে গেছে কৃষ্ণবর্ণে।

কিন্তু শ্বেতকায়ের মনোবৃত্তি যাবে কোথায়? সেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্রোমোজোমে জড়িত সেই প্রবৃত্তি। তাই শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর মনে সংক্রমিত হল গৌরবর্ণ মানবের ধর্ম—তাই ত এত হিংসা-সংগ্রাম-প্রভুত্ব-প্রিয়তা, তাই ত পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা-বিদ্বেষ-হানাহানি।

১৯৪৭ সালে তারই একটা পূর্ণাংগ প্রদর্শনী হয়ে গেছে সপ্তসিন্ধুর পবিত্র ভূমিতে! এবং সে অনুষ্ঠানের নীতি কথা, মানুষ মানুষকে মারবে, এ আর এমন বড় কথা কি? স্বধর্মে থেকে স্বজাতির হাতে মরার সুযোগ হওয়া সৌভাগ্যের কথা, মানব জাতির শত্রুর হাতে ত প্রাণটা তুলে দিতে হচ্ছে না। তবে পদ্ধতিটা যদি সামান্য অমানুষিক হয়, তাতে কিছু যায় আসে না।

সম্বিৎ ফিরে আসে, কি আবোল তাবোল চিন্তা করছিলাম? নিজের সম্বন্ধেও একটু আতংকিত হয়ে পড়ি, সমালোচকরা যাকে বলে সিনিক, এ কি তারই লক্ষণ?

*　　　*　　　*

সামনে পড়ল বিরাট এটক ব্রিজ, তার তোরণের দু-পাশে চারজন করে রাইফেলধারী রক্ষী, আসানিসে খাড়া হয়ে নয়, সাওধানে, যেন রণং দেহি ভাব। তাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলাম, ছেড়ে এলাম সপ্তসিন্ধু। এবার বুঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ পাঠান হবে আমাদের সাথী, সজোরে চালিয়ে দিলাম সাইকেলখানা।

সমাপ্ত